প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২
প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা—
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও
মুদ্রাকর— সুকুমার চৌধুরী
বাণীশ্রী প্রেস
৮৩-বি বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স
দুই টাকা

এই লেখাটি মাসিক বসুমতীতে 'মীনাকুমারী' নামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল।

তাঁর দপ্তরের আত্মহত্যা বিভাগ থেকে জরুরী ফাইল টেনে নিয়ে বসেন চিত্রগুপ্ত; মিনাকুমারীর ঘটনাবহুল জীবনের ফাইল। • আত্মহত্যায় মরতে হবে মিনাকুমারীকে—এ তাঁর প্রাথমিক নির্দেশ। তার জীবনের নাট্য আরম্ভ হওয়ার আগেই এই অমোঘ নির্দেশ দেওয়া হয়ে গিয়েছে। এর আর নড়চড় হওয়ার জো নেই। মিনাকুমারীদের জীবনের পুতুলনাচের সুতোটা তাঁর হাতে। চিত্রগুপ্তের নির্লিপ্ত চোখে মানুষগুলো তাঁর নির্দেশ পূরণ করবার মশলা, তার বেশী কিছু নয়। লোকে ভুল ভাবছে যে তাঁর দেখান পুতুলনাচের উপকরণ—রক্ত-মাংসে গড়া, সুখে-দুঃখে ভরা মানুষ। লোকে ভাবছে যে ঘটনাচক্রই জীবনের কাহিনী গড়ে তুলছে; বুঝছে না যে এ চাকা ঘোরাচ্ছেন চিত্রগুপ্ত। পুতুলের উপর মিনা করে কারিগর, আর জীবনের উপর মিনা করেন তিনি।

লাইন দিয়ে বাঁধা মিনাকুমারীর জীবন। বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীর রিপোর্ট, বিভিন্ন মনচিত্রের নকল, মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতের বিবরণ—সব প্রমাণের উদ্যত সূচিমুখ ঐ আত্মঘাতিনীর অন্তিম মুহূর্তের দিকে কেন্দ্রিত হয়েছে কি না তাই দেখছেন চিত্রগুপ্ত।

চিত্রগুপ্তের কথাই ভাবছিল শিউচন্দ্রিকা, অভিমন্যুর চিতার পা(
বসে। তার মত যুক্তিবাদী লোকেরও শ্মশান-বৈরাগ্য এসেছে এ(
মনে। অদ্ভুত ভাবে জট পাকিয়ে যাচ্ছে তার চিন্তাগুলো। (
করেছিল প্রথমটায় যুক্তির শলাকা দিয়ে এর গ্রন্থি আলগা করতে
পারেনি। ইউনিয়ন অফিসে আবার ফিরে যাওয়ার আগে পার(
না। সে আবছা ভাবে বুঝছে যে তার মন এখন স্বাভাবিক নেই। ত
সে এই শ্মশান-বৈরাগীর রুগ্ন মনটার বাঁধন আলগা করে দিয়ে(
যাক যেদিকে যেতে চায়।

১৯৪৮ সালের একত্রিশে জানুয়ারী আজ। মহাত্মাজীর তিরোধা(
পরদিন।

শীতের সন্ধ্যার ঝুপসী অন্ধকার আরও ঘন হয়ে আসছে ন(
ধারের কুয়াশার জন্য। কালো জলে চিতার আগুনের আলো পড়
বৈতরণীর উপর গড়ে উঠেছে গলানো সোনার সেতু। চারি (
অগণিত লোকের মেলা। নির্বাক্ নিশ্চল জনতার ভিড়টা চিতার
দিকে জমে চাপ বেঁধে গিয়েছে। একটা ছোট্ট দলের মধ্যে (
ভেসে আসছে রামধুনের গান। শোকাতুর লোকগুলোর, তার
ক্ষীণ সুরের যোগান দেওয়ারও উৎসাহ নেই।

কার প্রাপ্য কে পায়। মহাত্মাজী পরলোকে যাবার পর(
তাঁর বিভূতি ধার দিয়ে যেতে পারেন অভিমন্যুকে, সে কথা ‘বলীর(
জুট মিল’এর ম্যানেজার ম্যাকনীল সাহেব ভাবতেও পা(
মহাত্মাজীর ছবিওয়ালা মিছিল দেখে সে এসেছিল শ্রদ্
নিবেদন করতে। তারপর, সকলের সঙ্গে এসেছে শ্মশানে।
দেখা-দেখি কারখানার সব অফিসাররাও জুতো খুলে (
বসেছে; কিন্তু কারও আত্মম্ভরিতা সম্পূর্ণ ভাবে ঢাকা
শিষ্টাচারে।

তাদের কাছাকাছিই বসেছে মেয়ের দল—মিনাকুমারী, রুকণী, বলীরামপুরের আরও কত অজানা মেয়ে, কত মিলের মজুরণীরা। ঐ তো মিনাকুমারী কাঁদছে ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে ;—রজনীগন্ধার ডাঁটা মুচড়ে মুচড়ে ভাঙ্গছে কে যেন। প্রাণপণ চেষ্টা করেও তার বাধা মানছে না। চোখের জল যদি শুকিয়ে না গিয়ে থাকে তাহ'লে এই তো সময় চোখের জল ফেলবার। তার ইচ্ছা হয় চিতার আরও কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, চিতার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এতগুলো চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে কি না, সেদিকে তার খেয়ালই নেই। কান্না চাপবার চেষ্টায়, ঝড়ে তোলপাড় খাওয়া বুকটা ফেটে যাবে বুঝি এইবার। রুকণী তাকে ধরে রেখেছে। সে বুঝছে তার বন্ধুর মনের ব্যথা।

পৃথিবীশুদ্ধ লোক আজ নিজেকে দোষী মনে করছে। দোষী মনে করছে নিজেকে ম্যাকনীল সাহেব, দোষী মনে করছে নিজেকে শিউচন্দ্রিকা, দোষী মনে করছে নিজেকে মিনাকুমারী ; দোষী মনে করছে নিজেদের রুকণী, রহমতের বিবি, সরযূ সিং, প্রতিটি মজুর-মজুরাণী, এমন কি মিলের এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার জয়নারায়ণ পর্যন্ত। যা ঘটেছে তা বন্ধ করার কি কোন পথ ছিল না ? নানা রকমের অতি সোজা উপায় এখন সকলের মনে পড়ছে। সকলে ভাবতে চেষ্টা করছে যে, সে নিজে এই অঘটনের জন্য কতটুকু দায়ী। এত দুঃখের মধ্যেও শিউচন্দ্রিকা এই ভেবে স্বস্তি পায় যে পুলিশে পোষ্টমর্টেম করেনি দেহটাকে।

বড় আগুনটা কাছে থাকায় চারিদিক থেকে ছুটে আসছে ঠাণ্ডা হাওয়া এদিকে—একটু গরম হয়ে নেওয়ার জন্য। সঙ্গে করে নিয়ে আসছে অসংখ্য শীর্ণ শুকনো ঝরা পাতা। কতক চিতার বুকে দপ করে জ্বলে ছাই হয়ে যাচ্ছে ; কোন কোনটা ছুটে যাচ্ছে নদীর বুকে, তারপর ভেসে চলে যাচ্ছে আঁধার বিস্মৃতির স্রোতে। বিচ্ছিন্ন চিন্তার

টুকরোগুলোও শুকনো পাতার মত মুহূর্তের মধ্যে কোথায় উড়ে চলে যায়, যে-ঝড় মনের মধ্যে দিয়ে বইছে তারই ঝাপটায়।···

শিউচন্দ্রিকার জ্ঞানের অন্ধকারের মধ্যে চিতার আলোর ঝলকানি লাগছে। এই আলো-আঁধারের মধ্যে মানুষের জীবন-মৃত্যুর কত নতুন কথা সে হাতড়ে বেড়াচ্ছে।··

···কপালের লেখা···সপ্তরথীতে ঘিরে ধরেছিল অভিমন্যুকে। নিস্তার ছিল না তার তাদের হাত থেকে।···

চিতার আলোতে মনে হচ্ছে যে একটা ফাইলের পাতার পর পাতা খুলে যাচ্ছে। চোখের সামনে ফুটে উঠছে এক-একটি দলিল। জীবনের ছক কি আগে থেকে কাটা থাকে? চিত্রগুপ্তের মহাফেজখানায় কি বাঁচবার' দাবির ফাইল রাখা থাকে সকলেরই? রায় বেরিয়ে যায় কি জন্মানোর মুহূর্তেই? রায়' ঠিক হয়ে যাওয়ার পরই কি চিত্রগুপ্ত তাঁর নথি-পত্র, সাক্ষী-সাবুদ, বেঁচে থাকার ছোট-খাটো খুঁটিনাটিগুলো সংগ্রহ করে ফাইলে রেখে দেন? ঠিক বোমার মামলার রায়গুলোর মত জীবনের মামলার রায়ও কি আগেই ঠিক হয়ে যায় —তারপর চলে প্রমাণ সংগ্রহের কাজ? এত ডাক্তার-বদ্যি, ওষুধ-পথ্য, ব্যায়াম শরীরচর্চা, হাওয়া-বদল, সবই কি—জীবনের প্রহসনের এক একটি দৃশ্য—নিরর্থক, অসার্থক, উদ্দেশ্যহীন? অদ্ভুত প্রমাণ সাজানোর ক্ষমতা চিত্রগুপ্তের। দূর-দূরান্তরের বিচ্ছিন্ন ঘটনা, সময় সময়ান্তরের অসংলগ্ন দলিল, চিতার আগুনের ঝিকমিকে রাংঝাল দিয়ে জুড়ে যাচ্ছে। মাঝের অন্ধকার গলি-ঘুঁজিগুলোর উপরও চিতার ঝলকানি মশাল তুলে ধরেছে।

তবে কেন মানুষের এত চেষ্টা বেঁচে থাকবার। নিশ্চিত পরাজয় জেনেও লড়বার এ অদম্য ইচ্ছা কেন? বেঁচে থাকবার অধিকারটা একটা মোকদ্দমার জুয়ো-খেলা হলেও খেলে দেখা চলে; কিন্তু পরাজয়

সম্বন্ধে যখন কোন অনিশ্চয়তাই নেই, তবু কি নিজের ঘুঁটি চালাতেই হবে। লোকে নেশায় মামলা লড়ে, জিদে পড়ে লড়ে, কুপরামর্শ পেয়ে লড়ে। জীবন-যুদ্ধেও কি লোকে নামে ঐ সব কারণেই? লোকে বুঝতে পারে না—কিন্তু প্রত্যেকটি দলিলের, প্রত্যেকটি ঘটনার গতিপথ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কশাঘাতে। এক অদৃশ্য হাত দৃঢ় লাগাম ধরে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে বিজয়-রথ এক চক্রব্যূহের কেন্দ্রের দিকে। কোন শক্তি নেই যা তার গতিরোধ করতে পারে, কোন ঘটনা নেই যা তার গতিপথে দাঁড়াতে পারে। রথের অক্ষের সঙ্গে লাগানো আছে ক্ষুরধার ধাতুফলক—ঠিক যেমন একটা শিউচন্দ্রিকা মিউজিয়মে দেখেছে; —তার কাছে যায় কার সাধ্য।···

তুরুপের তাস অপর পক্ষের হাতে। পারবে না, মাথা কুটে মরে গেলেও পারবে না।···

আলেখাইন আর কাপাব্লাঙ্কার ফটো বার কর তোমরা কাগজে। কিন্তু দেখেছো না, একসঙ্গে কোটি কোটি দাবার ছকে প্রতিটি চাল কেটে, কূট দৈবী চাল পড়ছে। সামলাতে চায় মানুষ, বেশী থেকে বেশী একশ' বছর পরমায়ুর গণ্ডীর মধ্যে জোটানো অভিজ্ঞতা যার পুঁজি, মাত্র ছয় হাজার বৎসরের সভ্যতা যার গর্ব, দশ হাজার বছরের অলিখিত ইতিহাস যার জ্ঞানের সম্বল। এ সৃষ্টি মানুষের জন্য নয়। নীহারিকার যুগ থেকে আজ পর্যন্ত অসংখ্য জিনিসের মত, সৃষ্টির অজ্ঞাত উদ্দেশ্যের সে একটা উপকরণ মাত্র। কাকতালীয় বলে পৃথিবীতে কোন জিনিস নেই। যা অবশ্যম্ভাবী তাই ঘটে থাকে।

···অভিমন্যুর চিতার সম্মুখে বসে শ্মশান-বৈরাগ্যের এই দর্শন সত্য বলে মনে হচ্ছে শিউচন্দ্রিকার। অভিমন্যু সম্পত্তির মধ্যে রেখে গিয়েছে এই খদ্দরের আধছেঁড়া আধময়লা ঝোলাটা। শিউচন্দ্রিকা এটাকে সঙ্গে এনেছিল চিতায় ফেলে দেবে বলে। অতি পরিচিত এই

ঝোলাটার মধ্যে কি কি আছে সে সম্বন্ধে আগে থেকেই একটা আন্দাজ করে নিয়েছে ; কি আর থাকবে—পাজামা, একখান ধুতি হয়ত, আর খুচরা টুকি টাকি জিনিস যা সফরের সময় প্রত্যহ কাজে লাগে। তবু একবার দেখে নেওয়া ভাল।···ঠিক তাই। ঠিক শিউচন্দ্রিকা যা ভেবেছিল। এত কাল অভিমন্যুর সঙ্গে একসঙ্গে থেকেছে, আর এটুকু জানবে না সে! ছেঁড়া কাগজপত্রগুলোই একটু ভালো করে দেখা দরকার। গ্রামের চাষাদের দরখাস্ত আঙ্গুলের ছাপ দেওয়া। চিতার অস্থির আলোতে কালো দাগগুলোকে বুড়ো আঙ্গুলের ছাপ বলে বুঝবার জো নেই ; মনে হচ্ছে যে ছেঁকা লেগে পুড়ে পুড়ে গিয়েছে ঐ জায়গাগুলো। এমন অগোছাল স্বভাব অভিমন্যুর যে, দরখাস্ত, কাগজ-পত্র, তার সারা আফিসটি ভরে নিয়েছে ঐ ঝোলার মধ্যে। এ বদ অভ্যাস তার শেষ দিন পর্যন্ত গেল না। যাক, সব তো শেষই হয়ে গিয়েছে ; আজকের দিনে তার স্বভাবের ঢিলেমির কথা ভেবে আর তার স্মৃতিতে কলুষ আনতে চায় না শিউচন্দ্রিকা। দাড়ি কামানোর ক্ষুরের বাক্সটা খুলেই নজরে পড়ে দু'খানি কাগজ, সযত্নে ভাঁজ করে তুলে রাখা। প্রথমখানি ভৃগুর গণণা ; এ কাগজখানিকে বহু বার দেখেছে শিউচন্দ্রিকা এর আগে। দ্বিতীয়খানি একটি চিঠি, মিনাকুমারী লিখেছে অভিমন্যুকে। আশ্চর্য হয়ে যায় সে। এর কথা অভিমন্যু ঘুণাক্ষরেও জানায়নি কাউকে কোন দিন। ঠিক মিনাকুমারীরই লেখা তো? শিউচন্দ্রিকার দৃষ্টি আপনা হতে গিয়ে পড়ে মিনাকুমারীরা যে দিকে বসে আছে সেই দিকে। হাঁটুতে মুখ গুঁজে মিনাকুমারী এখন বসে আছে। রুকণীর হাত তার পিঠের উপর। খানিক আগেও একবার শিউচন্দ্রিকা দেখেছিল মিনাকুমারী কাঁদছে। লোক-দেখানি দুঃখ নয় তো তার?

ঝোলাটাকে আগুনে ফেলতে তার মন সরে না। অভিমন্যুর শেষ স্মৃতিটুকু তবু তো থাকবে এরই সঙ্গে মিশে।

……"জন্ম ১৩২৫, উনিশে ভাদ্র, শুক্লা অষ্টমী, প্রাতে……তুলা-লগ্ন, ভাগ্যনিয়ন্তা গ্রহ প্রজাপতি……জাতক বাল্যে মাতৃহীন; বুদ্ধিমূল দৃঢ় নহে; বাল্যে উদরপীড়া; পল্লবগ্রাহী; চিত্ত দুর্বল; সপ্তদশ বর্ষে পিতৃভয়; অপঘাত; দৈবরক্ষা; জাতকের কর্মের সহিত জনসাধারণের সম্বন্ধ থাকিবে; জাতক সাধারণতঃ আনন্দপ্রিয়, নিজেই নিজের মৃত্যুর কারণ হইতে পারেন, রুদ্র ও মঙ্গলই জাতকের প্রবল মারক, উনত্রিশ বৎসর বয়সে মহারিষ্ট; রিষ্টান্তে বাঁচিলে পূর্ণায়ু ষাট বৎসর; আয়ুরক্ষার্থ প্রয়োজন আয়ুদযন্ত্র অথবা সন্ন্যাস; রাজভয়; বন্ধুস্থানে সুখ; শেষ বয়সে বন্ধুকৃত ঋণমুক্ত; পূর্বজন্মে যোগী, গুরুর সহিত বিরোধ বশতঃ পুনর্জন্ম।"……

অনেকগুলো সম্ভাব্য গণণা জ্যোতিষী পড়ে শুনিয়েছিলেন—তার মধ্যে এইটাই অভিমন্যুর ঠিক বলে মনে হয়েছিল। গণক ঠাকুর পড়ে গিয়েছিলেন, আর সে লিখে নিয়েছিল একখানা কাগজে। সবটা লেখেওনি। যেটুকু লিখেছিল, তাড়াতাড়িতে সেটুকুও নির্ভুল ভাবে লিখতে পারেনি।

আসামী অভিমন্যুর বিরুদ্ধে, চিত্রগুপ্তর প্রথম দলিল ভৃগুর গণনার ঐ কাগজখান। কাশীর ভৃগু, চিত্রগুপ্তের মহাফেজখানার রেকর্ডকীপার কি না জানি না, যদি না হন তা'হলে নিশ্চয়ই সেই দপ্তর থেকে দলিলের নকল আনবার তাঁর সুবিধা আছে।

তাই কাশী থেকে গণিয়ে এনেছিল অভিমন্যু। তার হাত-দেখানোর বাতিক চিরকালের। তার দোষ ছিল যে সে সকলকে বিশ্বাস করতো—কেবল হাত-দেখানোর ব্যাপারে নয়, প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি বিষয়ে। এর জন্য কত বার তাকে কত বিপদ, কত অসুবিধাতে পড়তে হয়েছে। শিউচন্দ্রিকা আর অন্য বন্ধুরা কতবার তাকে সাবধান করে দিয়েছে, কিন্তু কারও কথা কি সে গ্রাহ্য করতো?

কত সাধু-সন্ন্যাসী-ফকিরকে দিয়ে যে সে হাত গণিয়েছে তার ঠিক নাই। কেউ বলেছে যে সে রাজা হবে, কেউ বলেছে যে সে সুখে ঘর-সংসার করবে নাতিপুতি নিয়ে, কেউ বা তার চেহারা দেখেই বুঝেছে যে সে খুব দানশীল লোক। সে শুনে গিয়েছে সব। পূরো দক্ষিণা দিয়েছে বেশ তুষ্ট চিত্তেই। এ সব শুনতে ভাল লাগে তার, কিন্তু যতক্ষণ না জ্যোতিষী ঠাকুর খারাপ কিছু বলেছেন, ততক্ষণ তাঁর কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। আবার খারাপ লাগবার পর মনের মধ্যে খচ্-খচ্ করলে মনকে বুঝোয়,—জ্যোতিষীর কথার আবা[illegible]-ঠিকানা, এক-এক জন এক এক রকম কথা বলে।......

অনেকদিন আগে সেই যে-বার লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেস হয়, সেইবার রাণীপত্রার পত্তনিদার তালেবর মণ্ডল খরচ দিয়েছিলেন অভিমন্যুকে কংগ্রেস অধিবেশন দেখবার জন্য। তাঁর ছেলেও ছিল অভিমন্যুর সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের অধিবেশনে পৌছুতেই পারেনি অভিমন্যু। কাশীতেই সে নেমে গিয়েছিল, আর সেখানেই তার দেরী হয়ে যায়। এই কথা নিয়ে জেলার রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে খুব হাসাহাসি পড়ে যায়। সকলেই এ নিয়ে অভিমন্যুকে ঠাট্টা করতো। অভিমন্যু সে সব কথা গায়েও মাখতো না। হেসে জবাব দিতো, আমার প্রিয়ার অম্বলের ব্যায়রাম হবে কি না তাই গুণিয়ে নিতে গিয়েছিলাম; খবদ্দার অম্বুলে রুগীর সঙ্গে প্রেমে পড়ো না। আর যখন মনের ভাব এতটা হালকা থাকতো না তখন বলতো—"রাজনীতিতে আমাদের চলছে জন্মগত দাবির কথা, নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের কথা। ত[illegible] আমি আনতে গিয়েছিলাম, চিত্রগুপ্ত দ্বারা স্বীকৃত আমার অধিকারটুকুর একখান লিখিত দলিল; জীবনের দাবির মামলায় তাঁর দেওয়া রোয়েদাদ। আমার কাছে আমার জীবনের 'চার্টার'এর মূল্য কি নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের 'চার্টার'এর চাইতে কম?

সেই থেকে সকলেই অভিমন্যুর এই ভৃগুর গণনার কাগজখানার কথা জানে।

আর দশ জন বিহারের রাজনৈতিক কর্মীর মত সে-ও ঘুরতো খাদি-ভাণ্ডারের পেটেণ্ট মার্কা একটা খদ্দরের ঝোলা নিয়ে। অন্য সকলের মতই ঝুলিটা রাখতো হাতে চব্বিশ ঘণ্টা, কেবল রাতে শোবার সময় সেটা হয়ে যেত বালিশ। সেই ঝোলাটার মধ্যে কি থাকতো আর কি থাকতো না! পাজামা, গামছা, পার্টির চাঁদা তুলবার রসিদ বই, রঙ-বেরঙের ইস্তাহার, কত রকমের দরখাস্তের আর প্রতিজ্ঞাপত্রের ফর্ম, নিমের দাঁতন, কাপড়কাচা সাবান, আরও কত কি; এরই মধ্যে জায়গা পেয়ে গিয়েছিল ভৃগুর ঐ লম্বা কাগজখানিও। উনত্রিশ বছর বয়সে তার মস্ত ফাঁড়া আছে, লাল পেন্সিল দিয়ে ঐ জায়গাটার নীচে দাগ দেওয়া ছিল। ঐ লেখাটির সে অর্থ করে নিয়েছিল যে সে উনত্রিশ বছরই বাঁচবে, তার বেশী নয়। বাকী কথাগুলো তাকে প্রবোধ দেবার জন্য জ্যোতিষী ঠাকুর লিখে দিয়েছেন, এইটাই তার ছিল আন্তরিক ধারণা। আসল ভৃগু সে দেখেছিল সংস্কৃততে লেখা। এই জন্যই কাগজখানার কালির আঁচড়গুলোর উপর তার বিশ্বাস ছিল এত বেশী। নিরিবিলি থাকলে বারবার পড়ে ঐ কথাগুলো থেকে আর কোন নতুন অর্থ বার করা যায় কি না, তারই চেষ্টা করত। বন্ধুদের কাছে ঐ কথার মানে জিজ্ঞাসা করত, অভিধান পেলে তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়তো।

রাজনৈতিক কর্মীর জীবন সে নিয়েছিল, ঐ জীবন সে ভালবাসে বলে নয়। অধিকাংশ লোকের মত তার কৈশোরের ভাবপ্রবণ মনকে উদ্বেলিত করেছিল রোমাঞ্চকর রাজনীতির স্বপ্ন-উন্মাদনা। প্রথম নেশা কাটবার পর এর দুর্বার আকর্ষণ শিথিল হয়ে এলেও অধিকাংশের মত সে-ও থেকে গিয়েছিল গতানুগতিকতার চাপে, অলস মনের স্বাভাবিক ঔদাসীন্যে, কর্মী বন্ধুদের সঙ্গলিপ্সায়। এ ছাড়া আছে গাঁদা ফুলের

মালার উপর লোভ; জনপ্রিয়তা এত সস্তা আর কোথাও নয়। আর এই রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে সরে যাওয়ার প্রাথমিক সঙ্কোচ, ছেড়ে যাওয়ার পথে সেটাও কম বড় বাধা নয়। বিহারে এই রাজনীতির ক্ষেত্র ছেড়ে চলে যাওয়াকে বলে 'বসে যাওয়া'—মাঝ-পথে গাড়ীর বলদের বসে পড়ার মত, হাজার চাবুক মারো নড়বার নামটি নেই,—সেই রকম আর কি।

হয়তো এই রকম আরও অনেক কারণ ছিল অভিমন্যুর রাজনীতি ক্ষেত্রে থেকে যাওয়ার; জটিল মনের গোপন গ্রন্থিগুলির খবর অনেক সময় নিজেই জানা যায় না।

সুন্দর চেহারা ছিল তার। রঙটা ফুটফুটে ফরসা নয়। তবে তার নিখুঁত মুখশ্রী, আর ছয় ফুট লম্বা ঋজু অথচ নমনীয় দেহ, সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করত। অনেক দিন আগে, সেই প্রথম যেবার এই মজুর ইউনিয়নটি খোলা হয়,—তখনও রেজিষ্টারী করা হয়নি, সেই সময় এক জন মজুরের তিনটে আঙ্গুল কেটে গিয়েছিল কলে। তারই ক্ষতিপূরণের সম্বন্ধে কথা বলবার জন্য ম্যাকনীল সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হয়েছিল ইউনিয়নের সেক্রেটারী শিউচন্দ্রিকাকে। সঙ্গে ছিল অভিমন্যু। ম্যাকনীল সাহেব তখন সবে নতুন এসেছে এদেশে। তা না হলে কখনও কি কোন ম্যানেজার, একটা বিনা রেজিষ্টারী করা, বিনা স্বীকার করা ইউনিয়নের প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করে? সেদিন ম্যাকনীল সাহেব অভিমন্যুকে সেক্রেটারী মনে করে তারই সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ করেছিল। বেঁটে, কালো শিউচন্দ্রিকার উপর সাহেবের নজরই পড়েনি। শিউচন্দ্রিকার কালো মুখখানা বেগুনী রঙের হয়ে উঠেছিল। অভিমন্যু অপ্রস্তুত হয়ে সাহেবকে আসল সেক্রেটারীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। সাহেব বোধ হয় ভাবলো যে শিউচন্দ্রিকা মজুরদের মধ্যে থেকেই উঠেছে, আর অভিমন্যু অভিজাত বংশের ছেলে বলেই মজুররা তাকে সেক্রেটারী

করেনি ইউনিয়নের। সে মনগড়া এই ধরণের একটা কিছু ভেবে নিয়েছিল। শিষ্টাচারের খাতিরে জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে "আমি দুঃখিত" বলে শিউচন্দ্রিকার সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ করে। চেহারা দেখেই কারও সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নেওয়া ঠিক নয়, এ কথা সাহেব কিছুক্ষণ শিউচন্দ্রিকার সঙ্গে কথা বলবার পরই বোঝে। শক্ত চোয়াল, আর বুলডগের মত চওড়া থুতনিওয়ালা কালো লোকটি চমৎকার ইংরাজী বলে। অদ্ভুত উজ্জ্বল তার ছোট ছোট চোখ দু'টো ; নির্ভীক, তীক্ষ্ণ, আর গভীর তার দৃষ্টি। সাহেবের মনের মধ্যে অস্বস্তি জাগছিল যে লোকটা নিশ্চয়ই তার মনের ভিতরটা দেখতে পাচ্ছে। সে বোঝে যে আর যাই কর, এ লোকটিকে তাচ্ছিল্য করবার উপায় নেই। সময় হয়েছে বুঝিয়ে ওয়ার জন্য ভদ্রতার খাতিরে মণিবন্ধের ঘড়ি দেখলে ; ঐ চোখ দু'টোতে মুহূর্তের মধ্যে একটি আগুনের ঝিলিক জ্বলে ওঠে,—ঘড়ি কিনবার সঙ্গতি আছে বলেই কি কাজের কথা শেষ হওয়ার আগেই ঘড়ি দেখবার অধিকার পেয়েছ না কি ? আর সে শিষ্টাচারের ধার ধারে না। টেবিল চাপড়ে শিউচন্দ্রিকা তার বাকী কথাগুলো এই আনকোরা নূতন সাহেবটার গোবরভরা মাথায় ঢুকোতে চায়। যেই আসুক তার সম্মুখে, শিউচন্দ্রিকা থেকে সে বড় এ ভাব নিয়ে তাকে ফিরতে হবে না। এ কথাটা সেদিন বুঝেছিল ম্যাকনীল সাহেব। অভিমন্যুর মন ততক্ষণ উড়ে কোথায় চলে গিয়েছে,......অদ্ভুত আইনের এই সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচগুলো ; ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ঠিক হয় আঙ্গুল দিয়ে মেপে ; বুড়ো আঙ্গুল কাটলে এত টাকা, কড়ে আঙ্গুল কাটা গেলে এত টাকা, ডান হাত কাটলে এত, বাঁ হাত কাটলে এত ; আশ্চর্য !...

কেন জানি না, এই শিউচন্দ্রিকার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু হওয়ার মর্যাদা পেয়েছিল অভিমন্যু। বয়সে সে শিউচন্দ্রিকার থেকে ছোট।

কোন বিষয়ে দু'জনের চরিত্রে মিল নেই। রাজনীতি আর পার্টির কাজই শিউচন্দ্রিকার জীবন; আর কিছু সে জানে না; অন্য কিছু নিয়ে মাথা ঘামানোকেও সে একটা অনাবশ্যক বিলাসিতা বলে মনে করে। এই একমুখী চিন্তা তার সারা জীবনকে চালিত করে নিয়ে বেড়ায়। যে কোন প্রশ্ন তার সম্মুখে আসুক, সে তার পার্টির সুবিধা-অসুবিধার মাপকাঠি দিয়ে সেটাকে মাপবে। অদ্ভুত তার কর্ম-প্রেরণা, আশ্চর্য তার নিষ্ঠা। তার কর্মজীবনের সম্মুখে যে কোন বাধাই আসুক তাকে আটকাতে পারবে না। তার স্বভাবটা এমনই যে সে ঐ বাধাটাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করবে না। সে খুশী হবে যদি সেটাকে ভেঙ্গে-চুরে গুঁড়ো-গুঁড়ো করে রুদ্ধ পথ পরিষ্কার করে নিতে পারে। আর তা যদি সম্ভব না হয় তাহ'লে সে অন্ততঃ পক্ষে চাইবে সেটার উপর দিয়ে ডিঙ্গিয়ে যেতে।

এই একনিষ্ঠ নিঃস্বার্থ সেবার জন্য মজুররা তাকে ভালবাসে। তার মধ্যের সংসার-ছাড়া সন্ন্যাসীটিকে বলারামপুরের গেরস্থরা শ্রদ্ধা করে; তাদের বাড়ীর মেয়েরা করে ভক্তি। তার অক্লান্ত কর্মনিষ্ঠা আর দূরদৃষ্টির জন্য তার পার্টির লোকের সে আস্থাভাজন। আর কারখানার মালিকের দিকের লোকরা তাকে ভয় করে, যবে থেকে তারা জেনেছে যে এই লোকটার অনমনীয় বিবেক পয়সা দিয়েও কেনা যায় না।

বিনা যুক্তিতে শিউচন্দ্রিকার মন কোন জিনিস নেয় না, কিন্তু তার যুক্তির স্রোত চলে বাঁধা খাতে। তার প্রতিবেশের প্রত্যেক জিনিস, প্রত্যেক ঘটনা, প্রত্যেক লোক, তার পার্টির ভাল কিম্বা মন্দ করবার, সুবিধা কিম্বা অসুবিধা করাবার উপকরণ মাত্র। তা ছাড়া তাদের আর কোন নিজস্ব সত্তা নেই। তার চিন্তার বাঁধা লাইনে পার্টির সুবিধা-অসুবিধা, আর জনতার ভাল-মন্দর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। জনসাধারণের যথার্থ মঙ্গল করবার একচেটিয়া অধিকার শিউচন্দ্রিকার মতে আছে কেবল তার

পার্টির। এই সোজা কথাটা যারা স্বীকার না করে নেয়, তারা জনতার শত্রু। তাদের সঙ্গে অযথা কথা খরচ করবার সময় শিউচন্দ্রিকার নেই।

সত্যিই এক মিনিটও তার সময় নেই। রাতে ডায়েরী লিখবার সময় একখানা কাগজে লিখে রাখে কালকের কাজগুলো। একটুও নড়চড় হওয়ার জো নেই তাতে, একথা তার বন্ধু-বান্ধব সকলেই জানে। ঘড়ির কাঁটার মত দৈনন্দিন প্রত্যেকটি কাজে সে বিরামহীন, আর ক্লান্তিহীন। তার পরিচিত সকলের কাছেই সে আশা রাখে তার নিজেরই মত নিয়মানুবর্তিতার।

শিউচন্দ্রিকার ব্যবহারে এর ব্যতিক্রম দেখা যায় অভিমন্যুর বেলায়। পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের কারও এ কথা অজানা ছিল না। পার্টির সদস্যরা এই নিয়ে ঠাট্টা করলে শিউচন্দ্রিকা হেসে বলতো,—"অনেক চেষ্টা করবার পর আমি হাল ছেড়েছি। এ জীবনে ও এক চুলও বদলাবে না, যা আছে তাই থাকবে। মইয়ের সব চাইতে নীচের ধাপে যে বসে আছে তাকে আর নাবাবে কোথায় ?"

অভিমন্যু গম্ভীর হয়ে পাল্টা জবাব দিত—"বা রে! তোমার কোন্ কথাটা শুনি না, বলো ? আচ্ছা ধর, শুনিই না। আমার মাথার কাছে কালিপড়া ঝুপসী কেরোসিনের আলোটা রেখে, রোজ রাতে পরের দিনের কাজের ফিরিস্তি লিখতে আমি যে বারণ করি তোমাকে, সে কথায় তুমি কান দাও কোনো দিন ? তুমিও আমার কথা শোনো না, আমিও তোমার কথা শুনি না। দু'জনেই সমানে সমানে আছি দাঁড়িপাল্লার ওজনে।"

যত গুরুত্বপূর্ণ কথাই হোক না কেন, অভিমন্যু হেসে সেটাকে হালকা করে দেবেই।

হালকাই তার স্বভাব। হেসেই কাটিয়ে দিতে চায় জীবনের পথটাকে। চেষ্টা করে অভিমন্যুকে গম্ভীর হতে হয়, দরকার পড়লে।

কোন জিনিস তলিয়ে সে ভাবে না। কোন একটা বিষয়ে বেশীক্ষণ লেগে থাকতে হলে তার মন হাঁফিয়ে ওঠে।

নাচে-গেয়ে-খেয়ে-দাও গোছের শান্ত মন্থর জীবনে, মধ্যে মধ্যে দু'কূল-ভাঙ্গা প্লাবন আসবে, আর সেই সময় বানের মুখে গা এলিয়ে দেবে দ্বিধাহীন মনে, এই রকম জীবনই তার খেয়ালের সঙ্গে খাপ খায়। তার ভাবপ্রবণতার মধ্যে কৃত্রিমতার ভেজাল নেই; যে ভাবের বন্যায় সে যখন ভাসে, তখন তা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা পর্যন্ত করে না। জীবনের উপর তার মায়া নেই, সারা জগৎকে সে বেপরোয়া তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে—কাল কি হবে সে কথা নিয়ে আজ মাথা ঘামাতে চায় না। তবু তার হাত-গোণোনোর বাতিক যে কেন তা ভেবে পাওয়া যায় না। তার প্রাণখোলা আপনভোলা ভাবটার জন্যই বোধ হয় আর সকলের মত শিউচন্দ্রিকাও তাকে ভালবাসত। শিউচন্দ্রিকা আরও হিসাব করে নিয়েছিল যে ইউনিয়নের কাজ নিয়মিত সুচারু ভাবে না করতে পারলেও, অভিমন্যুর মত মজুরদের সঙ্গে মিশতে আর কেউ পারবে না; পয়সার লোভ দেখিয়ে কারখানার মালিক তাকে কিনে নিতেও কোন দিন পারবে না। সে আরও জানে যে ঠিক ভাবে তাতাতে পারলে অভিমন্যু বন্দুকের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করবে না। পার্টির অন্য সদস্যরা না বুঝুক, শিউচন্দ্রিকা জানে যে, একসঙ্গে এতগুলো গুণ অভিমন্যু ছাড়া, স্থানীয় পার্টি-সদস্যদের মধ্যে কম লোকেরই আছে। বেশীর ভাগই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার পর পর্যন্ত নিজের দিকেই তাকায়।

প্রিয় শিউচন্দ্রিকা বাবু,

ডাকবাংলাতে এখনই আমার সহিত দেখা করিলে বিশেষ আনন্দিত হইব। অভিমন্যু বাবুকেও সঙ্গে লইয়া আসিবেন।

কে, প্রসাদ

এস, ডি, ও, সদর

১৮. ১. ৪৬

এস. ডি. ও., সাহেবের তকমা আঁটা আরদালী চিঠিখান বলীরামপুর মজদুর ইউনিয়ন অফিসে, শিউচন্দ্রিকার হাতে দেয়। ঝুঁকে আদাব করে বলে, এস, ডি, ও, সাহেব সেলাম দিয়েছেন।

"অভিমন্যু! অভিমন্যু কোথায় গেল, দেখেছো না কি রহমৎ?"

রহমৎ আর রহমতের বিবি দু'জনেই-মিলে কাজ করে। রহমতের স্ত্রী সন্তান-সম্ভবা জানতে পেরেই মিল-কর্তৃপক্ষ তাকে কাজ থেকে বরখাস্ত করেছেন। এ আজ মাসখানেক আগেকার কথা। সে সময়েই সে তার পাওনা সাপ্তাহিক মজুরী নিয়ে নিয়েছে মিল থেকে। এত দিনে সেই কথা জানাতে এসেছে ইউনিয়ন অফিসে। সাপ্তাহিক মজুরী তুলে নেওয়ার আগে এলে ইউনিয়নের পক্ষ থেকে লড়বার সুবিধা হয়। "যখন বরখাস্ত করেছিল তখন আসতে কি হয়েছিল?"—চটে আগুন হয়ে উঠেছিল শিউচন্দ্রিকা। তারপর একখান দরখাস্ত লিখতে বসে।

এইখানটায় তোমার বিবির বুড়ো আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে এনো। বুঝলে?···কোন্ ডিপার্টমেণ্ট?—সেলাই ডিপার্টমেণ্ট বললে না?··· "এ সব করাচ্ছে হুজুর রামভরোসা সর্দার। আমি জানি ওকে ইটাগড় মিল থেকে। ও ছিল সেখানকার এক জন নামজাদা গুণ্ডা। মাইনে দিয়ে রেখেছিল মালিক তাকে। আবার এখানে এসে জুটেছে আমাদের জ্বালাতন করতে। বোধ হয় বেশী মাইনে পেয়েছে এখানকার মালিকের কাছ থেকে···

অনর্গল বকে যাচ্ছে রহমৎ

এস. ডি. ও. সাহেবের চাপরাসী এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। এখন জিজ্ঞাসা করে, হুজুর জবাব লিখে দেবেন না কি ?

ও ? তুমি এখনও দাঁড়িয়ে আছ না কি ! এস. ডি. ও. সাহেবকে বলে দিও এখনি আসছি আমরা। রহমৎ, তুমি ততক্ষণ দেখো তো অভিমন্যু কোথায় ? ডেকে নিয়ে এসো তাকে। বোলো, আমি ডাকছি। শীগ্গিরই। সাহু-ব্যারাকে দেখো। নিশ্চয়ই ওখানে ছেলেদের কোরাস গান শেখাচ্ছে।

রহমৎ অভিমন্যুকে খুঁজতে বার হয়। রহমতের বিবির দরখাস্ত লিখতে লিখতেও অভিমন্যুর কথাই ভাবে শিউচন্দ্রিকা।...যত বাজে কাজেই মন বসে অভিমন্যুর। কোন কাজ দায়িত্ব নিয়ে নিয়মিত করবে না।...

শিউচন্দ্রিকা উঁকি মেরে ইউনিয়ন অফিসের বাইরে টাঙ্গানো ব্ল্যাক-বোর্ডটা দেখে। তার উপর রোজ সকালে খড়ি দিয়ে খবর লিখে রাখবার ভার অভিমন্যুর উপর। এই ধরণের কাজ দিয়ে অভিমন্যুর আলগা কর্মজীবনকে বাঁধা ধরার মধ্যে ফেলতে চায় শিউচন্দ্রিকা।...ছোট্টো একটা দু'মিনিটের তো কাজ। এটুকুও করে উঠতে পারে না। হাতের কাজ রইল পড়ে, গিয়েছেন ছেলেদের গান শেখাতে !

বিরক্ত হয়ে শিউচন্দ্রিকা ব্ল্যাকবোর্ডটাকে টেনে নিয়ে তার উপর বড় বড় অক্ষরে খবর লিখতে বসে।

"অভিমন্যু !" রাস্তা থেকে কে এক জন যেন অভিমন্যুকে ডাকছে। গলা শুনে মনে হচ্ছে সরযু সিং। একবার এলে সে ঘণ্টাখানেকের আগে ওঠে না। শিউচন্দ্রিকা তার ডাকের জবাব দেয় না।

সব মজুর অভিমন্যুকে নাম ধরেই ডাকে, কিন্তু শিউচন্দ্রিকাকে নাম ধরে ডাকার কথা কেউ ভাবতেও পারে না। তাকে ডাকে "মন্ত্রিজী"

বলে। এ দেশের ভাষায় মন্ত্রিজীর মানে সেক্রেটারী সাহেব। অভিমন্যুকে মজুররা যত আপন বলে ভাবতে পারে, শিউচন্দ্রিকার বেলায় তা পারে না। শিউচন্দ্রিকা মজুরদের অন্তরের থেকে ভালবাসে, তাদের জন্য প্রাণ দিতে পারে, কিন্তু একটা মজুরের সঙ্গে গলা-জড়াজড়ি করে নিছক মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে যাক তো! সে পারে অভিমন্যু।

যে সরযূ সিং এখন অভিমন্যুকে ডাকছে সে ফিনিশিং ডিপার্টমেণ্টে কাজ করে। বছর দুই আগে তার গাঁয়ের ঘিনাওন সিং কলে কাটা পড়ে। দু'জনে একসঙ্গে এসেছিল বলীরামপুরে কাজ করতে। মজদুর ইউনিয়নের চেষ্টায় ঘিনাওন সিংয়ের স্ত্রী মিল থেকে সাড়ে আটশো টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে পায়। বিধবা স্ত্রীলোকটি ঐ টাকা শিউচন্দ্রিকার কাছে রেখে যায়; বলে যে অত টাকা একসঙ্গে নিয়ে গেলে শ্বশুরবাড়ীর লোকরা কেড়ে নেবে। ঐ টাকা থেকে মাসে মাসে শিউচন্দ্রিকা দশ টাকা করে ঐ স্ত্রীলোকটিকে পাঠায়। সরযূ সিং ঐ বিধবা মেয়েটির একজন সত্যিকার হিতৈষী। মনি-অর্ডারের রসিদ এসেছে কি না সেই কথাটা জানবার জন্য প্রায়ই ইউনিয়ন অফিসে আসে। অভিমন্যুর কাছে সে স্বীকার করেছে যে ঐ মেয়েটির সঙ্গে তার এক রকম বিয়ের ঠিকই ছিল। হঠাৎ ঘিনাওন সিংএর সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যায়। অভিমন্যু তাকে নিয়ে ঠাট্টা করে যে সে তার পুরোনো প্রিয়ার আঙ্গুলের ছাপ দেখতে এসেছে। মনি-অর্ডার পাওয়ার রসিদ তার হাতে দিয়ে হেসে বলে দু'দিন তুমি রাখতে পার এখানা তোমার কাছে, তার পর ফেরৎ দিয়ে যেও। শিউচন্দ্রিকা সে সময় উপস্থিত থাকলে সরযূ সিং ইসারা করে অভিমন্যুকে চুপ করতে বলে। হাত জোড় করে ফিস-ফিস করে বলে, দোহাই তোমার, মন্ত্রিজী শুনছে। আর শিউচন্দ্রিকা না থাকলে হেসে অভিমন্যুর কথা স্বীকার করে নিয়ে রসিদখানা বাটুয়াতে পুরে নেয়। তারপর গলা-

জড়াজড়ি করে ধরে অভিমন্যুকে চায়ের দোকানে নিয়ে যায়। এই ছিল মজুরদের সঙ্গের সম্পর্কে শিউচন্দ্রিকা আর অভিমন্যুর তফাৎ।

সরযু সিং শিউচন্দ্রিকাকে কাজ করতে দেখে আর অভিমন্যুর সাড়া না পেয়ে ফিরে গিয়েছিল। কিন্তু খানিক পরেই হাসির শব্দ পেয়ে শিউচন্দ্রিকা বুঝতে পারে যে অভিমন্যু সরযু সিংকে আবার ধরে নিয়ে আসছে।

কোথায় শিউচন্দ্রিকাকে ব্ল্যাকবোর্ডে খবর লিখতে দেখে একটু অপ্রস্তুত হবে, তা নয়, অভিমন্যু ঢুকেই একমুখ হাসি নিয়ে বলে—"চাবিটা দাও তো আলমারির। মনি-অর্ডারের রসিদটা বের করি। সরযু সিং বলছে যে একবার হাত বুলিয়ে নেবে আঙ্গুলের ছাপটার উপর।"

"ধেৎ!"— সরযু সিং শিউচন্দ্রিকার সম্মুখে এ-রকম কথায় লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি অফিস ছেড়ে পালিয়ে যায়। বলে যায়, ও-বেলা আসবো।

অভিমন্যু হেসে বলে, "যাক, আজকের ব্ল্যাকবোর্ডের খবরটা লোকে তবু পড়তে পারবে। লক্ষ্য করে থাকবে শিউচন্দ্রিকা যে যারা পড়তে জানে, তাঁরাও আজকাল খবর পড়তে আসে না। আমার শ্রীহস্তের লেখা দেখে ভড়কে গিয়েছে তারা, এ তুমি নিশ্চয় জেনো। তোমার আর কি, রোজ রাতে যখন পরের দিনের কাজের ফিরিস্তি লেখো, সেই সময় এই কাজের কথাটাও নোট করে নিলেই আপনা থেকে নিয়মিত এ কাজ হয়ে যাবে।"

শিউচন্দ্রিকা হেসে ফেলে। "নিজের ডিউটী করতে ভুলে গিয়েছো, কোথায় একটু লজ্জা পাবে, তা নয়, আমাকেই এসে উপদেশ দিতে বসলে?"

"আমার ভূগুখানা আবার বের করাবে না কি? তিনি কোথাও লিখে দেননি যে, আমি কোন দিন লজ্জা পাব।"

"আচ্ছা হয়েছে, এখন থামো। এই চিঠি দেখ এস, ডি, ও, সাহেবের। চল, যেতে হবে ডাকবাংলা।"

"তাই বল! রহমৎটা গিয়ে আমাকে খবর দিল একেবারে ফাঁসির আসামী তলব করবার মত করে। দাঁড়াও, দাড়িটা কামিয়ে নিই। এস, ডি, ও, সাহেব ডাকল কেন? লেবার কমিশনারের কাছে যে টেলিগ্রাম আর চিঠিগুলো গিয়েছিল তার ফল ধরেছে বোধ হয় এত দিনে।"

"রহমৎ মিঞা, তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে ডাকবাংলাতে।"

এস, ডি, ও, সাহেবই এখানকার ফ্যাক্টরী ইনস্পেক্টর, আলাদা ফ্যাক্টরী ইন্‌স্পেক্টর এ সাব-ডিবিশনে নাই। তাই এখানকার মিল-মালিকরা নূতন এস, ডি, ও, এলেই তাঁকে প্রথম হাত করবার চেষ্টা করে, কাউকে মদ খাইয়ে, কাউকে টাকা দিয়ে, কারও বা অন্য দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে। যা চাও সব জিনিষই ইসারা করা মাত্র পৌঁছে যাবে ডাকবাংলাতে।

সেই জন্য বলীরামপুর ডাকবাংলাটি নিত্য তিরিশ দিন সরগরম থাকে ছোট বড় রঙ-বেরঙের হাকিমের ভিড়ে। পদ অনুযায়ী মর্য্যাদা দেখানো হয় প্রত্যেককে। এস, ডি, ও, সাহেব আর তাঁর উপরের অফিসারদের বিকালে আমন্ত্রণ আসে ম্যানেজার সাহেবের কুঠির 'লন'-এ টেনিস খেলার জন্য। তার নীচের হাকিমদের নিমন্ত্রণ দেন মিলের সর্বেসর্বা এ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার জয়নারায়ণ প্রসাদ। আর চুনোপুঁটি—সরকারীকর্মচারা যাঁদের ডাকবাংলাতে উঠবার অধিকারই নাই, তাঁদের খাওয়া-দাওয়া-থাকার ব্যবস্থা আছে মিলের তরফ থেকে। এতেই তাঁরা সন্তুষ্ট; বেশী ঘাঁটানো ঠিক নয় উপরওয়ালার আলাপী লোকদের।

বর্তমান এস, ডি, ও, সাহেবের কিছু দিন থেকে বলীরামপুর

ডাকবাংলাতে আসা খুব বেড়ে গিয়েছে। মজুররা না কি ভারি 'trouble' দিচ্ছে, তারই অজুহাতে। দিনটা না হোক অন্ততঃ রাতটা এখানকার ডাকবাংলাতে কাটানোর লোভ তিনি সামলাতে পারেন না। এই নিয়ে জেলাশুদ্ধ লোক কাণাঘুযো করে, এখানকার মজুরদের তো কথাই নাই। কটাক্ষের লক্ষ্য বলীরামপুর অনাথালয়ের মেয়েদের উপর। মিলের এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার জয়নারায়ণ প্রসাদ এই অনাথালয়ের 'প্রেসিডেণ্ট'।

এই সব নিয়ে এস, ডি, ও, আর অন্যান্য হাকিমদের বিরুদ্ধে প্রচুর বেনামী চিঠি গিয়েছে পাটনার উপরওয়ালাদের কাছে। আর মজদুর ইউনিয়নের পক্ষ থেকে পাটনার লেবার কমিশনারের কাছে গিয়ে শিউচন্দ্রিকা বলে এসেছে যে এই এস, ডি, ও-র কাছ থেকে বলীরামপুরের মজুররা ন্যায়বিচার পেতে পারে না। ইঙ্গিতে কারণটাও বলেছিল। আর দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল যে মজুরদের সস্তায় খাওয়ার 'ক্যান্টিন', আর মেয়ে-মজুরদের কাজের সময় ছোট ছেলেপিলেদের রাখবার স্থান (ক্রেশে) মিলের তরফ থেকে খুলবার জন্য লেবার কমিশনার সাহেব হুকুম দিয়েছিলেন, গত বার যখন আসেন বলীরামপুরে তখন। আদেশ ছিল ছয় মাসের মধ্যে যেন খোলা হয়; তা আজ পর্য্যন্ত হয়নি। তাঁরই অফিসের ফাইলের চিঠি শিউচন্দ্রিকা লেবার কমিশনার সাহেবকে দেখিয়ে দিয়েছিল,—মিল-ম্যানেজার ম্যাকনীল সাহেব লিখেছে যে "সিমেণ্ট, লোহার শিক, ইট ইত্যাদি বাড়ী তৈয়ারী করিবার মাল না পাওয়ায় আপনার হুকুম তামিল করা সম্ভব হইতেছে না। ঐ সকল জিনিস পাওয়া গেলে বাড়ী তৈয়ারী কাজ আরম্ভ করিতে এক মুহূর্ত্তও দেরী করা হইবে না।" এর পর শিউচন্দ্রিকা দেখিয়ে দেয় কাগজে-কলমে যে এস, ডি, ও, সাহেবের সাহায্যে গত বছরে

গাড়ী তৈরী করবার মাল-মশলা মিল-ম্যানেজার কত পেয়েছে? ম্যানেজার সাহেবের নূতন টেনিসকোর্ট হ'ল কোথা থেকে? এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজারের একটা নূতন কোয়ার্টার আর অন্য অফিসারদের আর তিনটে কোয়ার্টার তৈরী করবার জিনিস-পত্র সে পেল কোথা থেকে? এ ছাড়াও আরও কিছু অবশিষ্ট লোহার শিক আর সিমেণ্ট ব্ল্যাক মার্কেটে বেচেছে এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার।

লেবার কমিশনার সংযত ভাষায় শিউচন্দ্রিকাকে বারণ করে দেন এ সব কথা বলতে—যা প্রমাণ করতে পারবেন না সে সব কথা বলে লাভ কি? তাতে কি আপনার কাজ এগোবে?

নিশ্চয়ই প্রমাণ করবো সার। প্রতিটি কথার পূরো দায়িত্ব নিয়ে আমি বলেছি! এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার জয়নারায়ণ প্রসাদের শালার দোকান আছে সদরে। কবে কোন গাড়োয়ান কি কি মাল নিয়ে গিয়েছে মিল থেকে সেই দোকানে, সব হিসাব দিতে পারি আপনাকে। তিন জন লোক যারা ঐ দোকান থেকে বেশী দাম দিয়ে সিমেণ্ট কিনেছে, তাদের দিয়ে দরকার হলে আপনার সম্মুখে বলাতেও পারি। এ সব ব্যাপার এস, ডি, ও, সাহেব জানেন সার। তিনি কড়া হলে কি আর আপনার হুকুম তামিল করে না একটা মিল-ম্যানেজার? এই হ'ত ডিভিসনাল কমিশনার সাহেবের হুকুম, দেখতাম এস, ডি, ও, সাহেব কি রকম করে সেটাকে অমান্য করতেন।

লেবার কমিশনার সাহেবের আত্মাভিমানে আঘাত লেগেছিল।

তার পরই এস, ডি, ও, সাহেব বলীরামপুর ডাকবাংলাতে এসে শিউচন্দ্রিকাদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তারা যা ভেবেছিল, ঠিক তাই। উপরের কড়া চিঠি পৌছেছিল জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে, এস, ডি, ও, সাহেবের সম্বন্ধে।

ডাকবাংলাতে গিয়ে দেখে যে এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার জয়নারায়ণ

প্রসাদও চা খাচ্ছেন বসে, এস, ডি. ও. সাহেবের সঙ্গে। রহমৎ ডাকবাংলার সিঁড়ির উপর বসে থাকে।

"এই যে সেক্রেটারী সাহেব, আসুন! ভাল তো, অভিমন্যু বাবু? বেয়ারা, আর দু'কাপ চা। দেখা যাক, এক টেবিলের চায়ের ধোঁয়ায় আপনাদের দু'পক্ষের সাপে-নেউলের সম্বন্ধ ঢাকতে পারে কি না, অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য।" এস, ডি, ও, সাহেব নিজের রসিকতায় নিজে হাসতে আরম্ভ করায় জয়নারায়ণ প্রসাদও ভদ্রতার খাতিরে সে হাসিতে যোগ দেয়।

"না, না, চায়ের দরকার নেই। আমরা চা খাই না।" শিউচন্দ্রিকার গলার স্বর এত দৃঢ় যে এস, ডি, ও আর তাকে অনুরোধ করতে ভরসা পান না।

তবু বলেন, "আমরা বলছেন কেন, আমি বলুন। অভিমন্যুজী, আপনি নিশ্চয় খাবেন এক কাপ?"

জয়নারায়ণ টিপ্পনী কাটে, "মিল-মালিক খাওয়ালেও আপনাদের মত লোকের আপত্তি না করে খেয়ে নেওয়া উচিত, অবশ্য যদি পেটের গোলমাল না থাকে। এক পেট খাইয়ে যদি আপনাদের কিনে নিতে পারতো, তাহলে নিশ্চয়ই ভয়ের কারণ ছিল খাওয়ায়। আর এ খাওয়াচ্ছেন আপনাকে এস, ডি, ও, সাহেব, মিল-মালিক নয়। তাও আবার কেবল এক কাপ চা। আমরা চাকর মানুষ, এ-আপত্তির কারণ আমরা বুঝতে পারি না সেক্রেটারী সাহেব।"

সাপ আর নেউল দু'জনেই মেজাজে আছে আজ। কিন্তু এস, ডি, ও সাহেব আজ অন্য চাল চালবার জন্য তৈরী হয়ে এসেছেন।

অভিমন্যুর মনে হয়, জয়নারায়ণ প্রসাদ ঠিক কথাই বলছেন। শিউচন্দ্রিকার সব-তাতেই বাড়াবাড়ি। একে শুচিবাই ছাড়া আর কিছু বলতে পারে না সে। শিউচন্দ্রিকা কি রহমৎ বাইরে সিঁড়িতে বসে

আছে বলে চা খেতে অস্বীকার করছে? না সেখান থেকে তো ঘরের ভিতরের কিছু দেখা যাচ্ছে না।…তিলকে তাল করা অভ্যাস শিউ-চন্দ্রিকার। শীতকালের দিনে এক কাপ চা খাবে, তাই নিয়ে একটা হৈ-চৈ করা, অনুনয়-বিনয়ের পালার সুযোগ দেওয়ার কি দরকার ছিল? চটুক শিউচন্দ্রিকা। তার খেয়াল মিটোবার জন্য অভিমন্যু সম্ভাব্য শিষ্টাচার ছাড়তে পারে না।…

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে অভিমন্যু শিউচন্দ্রিকার মুখ চোখ লক্ষ্য করে, তার চা খাওয়ায় সে বিরক্ত হয়ে গেল না তো? শিউচন্দ্রিকার চোখে মুখে কোন বিরক্তির চিহ্ন প্রকাশ পায় না। "যাক!" অভিমন্যু নিশ্চিন্ত হয়,—তার সঙ্গে থেকে থেকে তার বন্ধু তাহ'লে এ ভদ্রতাটুকু শিখেছে।

হাকিম জিজ্ঞাসা করেন, "চিনি ঠিক আছে? না আর একটু দেবো, অভিমন্যুজী?"

"আমরা পাড়াগেঁয়ে লোক। তাতে আবার কাজ করি মজুরদের মধ্যে। চা খাই খানিক চিনি আর দুধের লোভে। দিন, আর এক চামচ।"

"আর এই চিনির উপর এত লোভ বলেই তো দেখতে পাই যে আপনার ওখান থেকে একবস্তার পারমিট প্রতি মাসে পাওয়া সত্ত্বেও গুড় মিলিয়ে 'কেসর পাক' তৈরী করতে হয় অভিমন্যুজীকে"—রসিকতার ছলে জয়নারায়ণ প্রসাদ আজকের এই ব্রহ্মাস্ত্র শত্রুর অতর্কিতে প্রথমেই ছুঁড়ে মারেন।

এর একটা ইতিহাস আছে। বলীরামপুরের অধিকাংশ মজুর এখনও ইউনিয়নের চাঁদা দিতে চায় না, অথচ তাদের শিউচন্দ্রিকার উপর অগাধ বিশ্বাস। ১৯৩৭ সালে এখানে যখন প্রথম ইউনিয়ন হয়, তখন অনেক টাকা চাঁদা উঠেছিল। তার পর একটা মেয়ে সংক্রান্ত গোলমালে পড়ে

ই ইউনিয়নের সেক্রেটারী ইসরাইল মিয়াকে মার খাওয়ার ভয়ে
ালিয়ে যেতে হয়। তিনি যাবার সময় টাকাগুলো সঙ্গে নিয়েই
ায়েছিলেন। এর পর দ্বিতীয় মজুর ইউনিয়ন করেছিল
ামীরচন্দ। বেশ চলছিল ইউনিয়ন। কিছু দিন পর মজুরদের
ধ্যে কাণাঘুষো শোনা যায় যে, সে মিল মালিকের কাছ থেকে
াকা খেতে আরম্ভ করছে। একটা মিটিংএ মজুররা প্রকাশ্যে
াকে "ভাড়াটে দালাল" বলে গালাগালি দেয়, আর মেরে হাড়
াড়ো করে দেবে ব'লে ভয় দেখায়। সেই রাতেই সে কোথায় যেন
ধাও হয়ে যায়। এই সব নানা কারণে এখানকার বর্তমান ইউনিয়নটি
ক্তিশালী হলেও তার অর্থবল কম; খরচ চলে না। শিউচন্দ্রিকার মত
, আরও কিছু দিন মজুরদের উপর চাপ না দেওয়া ভাল; এমনিই
তা মিল-মালিকের দালালরা চব্বিশ ঘণ্টা বলে বেড়াচ্ছে যে, মজুরদের
াথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করা পয়সা ভাঁওতা মেরে লুঠে
াওয়ার জন্য এসেছে এই ইউনিয়নওয়ালারা। বিশ্বাসপ্রবণ মজুরদের
নে এ কথা যে একটুও সাড়া দেয় না তা নয়। তাই শিউচন্দ্রিকার
াত সতর্কতা। কিন্তু মজুরদের উপর চাপ না দিলে ইউনিয়নের খরচ
লবে কি করে? শিউচন্দ্রিকা গুছিয়ে আইন বাঁচিয়ে হিসাবপত্র লেখে
লেই রেজিস্ট্রীকৃত ট্রেড ইউনিয়নের নিয়ম-কানুন বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে
াজ পর্য্যন্ত। প্রথম প্রথম যখন খরচের টাকা জুটোনোর কথা ওঠে,
খন অভিমন্যুর মাথায় এক বুদ্ধি খেলে। তার কাকা ছিলেন, "বৈদ"
র্থাৎ গাঁয়ের হাতুড়ে বদ্যি। তাঁর কাছেই অভিমন্যু 'কেসর পাক' নামের
জিনিসটা তৈরী করতে শেখে। 'কেসর' মানে জাফরান। লোকে ভাবে
জাফরান দিয়ে তৈরী হয় 'কেসর পাক', অথচ এতে জাফরানের নাম-গন্ধও
াই। চিনি কিম্বা গুড়, চীনাবাদামের কুচি, ছোলার বেসম, কর্পূর, ছোট
এলাচ, খয়ের আর দুই-একটি কিসের যেন শিকড় না ছাল দিয়ে এক

রকম হালুয়ার মত জিনিস তৈরী করা হয়। এরই নাম 'কেসর পাক'। খুব শক্তিবর্ধক জিনিস বলে এর নাম আছে। অভিমন্যু প্রতি সপ্তাহে এক দিন করে কেসর পাক তৈরী করা আরম্ভ করলো ইউনিয়ন অফিসের উঠানে। এগুলো দিয়ে আসে স্থানীয় অনাথালয়ে। অনাথালয়ের হাফ-প্যাণ্ট-পরা ছেলেরা এ লাইনের প্রতি ট্রেনে তালা দেওয়া চাঁদার বাক্স, কোন এক ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের দেওয়া প্রশংসাপত্র আর চাঁদা-সংগ্রহের রসিদ বই নিয়ে মুখস্থ করা লেক্‌চার দিত। এর পর থেকে তারা প্যাকেটে করা 'কেসর পাক'-এর বরফিও বিক্রি করতে আরম্ভ করে। এর আয়টা নিয়ে আসে অভিমন্যু ইউনিয়ন অফিসে। অনাথালয় বিক্রির উপর কিছু কমিশন পায়। অনাথালয়েরও টাকার দরকার, তাই অনাথালয়ের প্রেসিডেণ্ট জয়নারায়ণ প্রসাদ বারণ করতে পারেনি এ জিনিস বেচা। এ রকম করে ইউনিয়নের জন্য টাকা যোগাড় করা, না শিউচন্দ্রিকা, না অভিমন্যু, কেউই পছন্দ করত না। কিন্তু উপায় কি? অফিস চালাতে হবে। পার্টি টাকা দেবে না। লোকে চাঁদা দেবে না। কেবল বললেই তো হল না। এই 'কেসর পাক' তৈরী করার জন্য প্রতি মাসে এক বস্তা করে চিনির 'পারমিট্' নিয়ে আসে অভিমন্যু, এস, ডি, ও, সাহেবের কাছ থেকে। কি করে আনে, কোথা থেকে আনে, এসব খবর অবশ্য শিউচন্দ্রিকা কোন দিন অভিমন্যুকে জিজ্ঞাসা করা দরকার মনে করেনি।

এই চিনির কথাই তুলেছিলেন জয়নারায়ণ প্রসাদ ডাকবাংলার চায়ের টেবিলে। সাপ আর নেউল এস, ডি, ও, সাহেবের ফরমাশ সত্ত্বেও নিজের নিজের স্বভাব ভুলতে পারেনি। এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজারের কথার ইঙ্গিত ছিল যে চিনিটা এনে ব্লাকমার্কেট করা হয়, আর গুড় দিয়ে 'কেসর পাক'-এর কাজ সারা হয়। দ্বিতীয়তঃ তিনি মনে করিয়ে দিতে চান দাম্ভিক শিউচন্দ্রিকাটাকে যে, যে অনাথালয়ের মেয়েদের নিয়ে তোমাদের

মধ্যে এত কানাঘুষো, এত হাকিমদের বিরুদ্ধে কেচ্ছা, এত বেনামী চিঠি; তোমরাও তো বাপু এর সঙ্গে জড়িয়ে ন্যাজে-গোবরে হয়ে রয়েছো।

এই 'কেসর পাক-এর ব্যাপারটাই বর্তমান ইউনিয়নের কার্য-কলাপের একমাত্র অশোভন অধ্যায়। এইটারই সুযোগ নিতে চায় এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার।

কথাটা শুনেই শিউচন্দ্রিকার চোখ দু'টো দপ্ করে জলে ওঠে। অভিমন্যু ভয়ে তটস্থ হয়ে যায়—এই বুঝি শিউচন্দ্রিকা চীৎকার করে বলে ওঠে যে, ম্যাকনীল সাহেবের পা-চাটা রোজগারের চেয়ে এ অনেক সম্মানজনক। শিউচন্দ্রিকা অতটা বোকা নয়। সে বোঝে যে জয়নারায়ণের কথাটার মধ্যের ইঙ্গিত এত সূক্ষ্ম যে, গায়ে পড়ে জবাব দেওয়া ভাল দেখায় না।

এস, ডি, ও, সাহেব এ কথায় খুশী কি দুঃখিত ঠিক বোঝা যায় না। হয়তো আগে থেকেই জয়নারায়ণ প্রসাদের সঙ্গে এ সব কথা হয়ে থাকবে। তবে তিনি এখন আর ঝগড়া-ঝাঁটি পছন্দ করছেন না। ছা-পোষা মানুষ তিনি, চাকরি-অন্ত প্রাণ। এই সব দায়িত্বজ্ঞানহীন রাজনৈতিক কর্মীগুলো, তোমার চাকরীতে ভাল করতে না পারুক, মন্দ করতে পারে ঠিকই। তাই কথাটা তাড়াতাড়ি চাপা দেবার জন্য বলেন, "চলুন সেক্রেটারী সাহেব, আজ মিলের ভিতর। আজ আর আপনাকে ছাড়ছি না। যে 'ক্যান্টিন' আর 'ক্রেশে'র (শিশুদের যে স্থানে রেখে সযত্নে দেখাশুনো করা হয়) দাবি ছিল আপনাদের, তার জন্য লোক নেওয়া হবে আজ। তাছাড়া কোথায় হবে, কেমন ভাবে চালানো হবে সব আপনারা সলা-পরামর্শ দেবেন; যাতে এই একই বিষয় নিয়ে বেশী বার দৌড়োদৌড়ি করতে না হয় আমাদের। বলীরামপুরের মজুরদের ছাড়াও আমার সাব-ডিভিসনে অনেক কাজ আছে।"

শিউচন্দ্রিকা আর অভিমন্যু দু'জনেই বোঝে যে উপরওয়ালার গুঁতো খেয়েছেন হাকিম সাহেব!

"একজন মিলের মজুর বাইরে বসে আছে। সে-ও সঙ্গে যাবে তা'হলে আমাদের।"—এই বিষয়টায় শিউচন্দ্রিকার স্থির মত আছে। কোন ইউনিয়নের কর্মী মিলের ভিতর গেলেই এক-আধ জন মিল-মজুরকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাবে এই অলিখিত নিয়ম শিউচন্দ্রিকা নিজেই জারি করেছে তার সাথীদের মধ্যে। তা না হলে মজুরদের সন্দেহবাতিক-গ্রস্ত মন, কোন কর্মীর সম্বন্ধে কখন কি ভেবে নেয় বলা যায় না। অমীরচন্দের কথা মজুররা আজও ভোলেনি। যে শিউচন্দ্রিকাকে আজ মজুররা মাথায় করে রেখেছে, একটা কোন গুজব রটলেই কাল তাকে লাথি মেরে নীচে ফেলে দিতে তারা বিন্দুমাত্র ইতস্তত করবে না।

এস, ডি, ও, সাহেবের গাড়ীতে করেই তারা সকলে মিলের ভিতর যায়।

জনকয়েক দাই (ঝি) ছাড়া আরও দু'জন মহিলাকে চাকরিতে নেওয়া হবে; এক জন থাকবেন 'ক্যান্টিন'-এর মেয়ে-মজুরদের খাওয়ার চার্জে, একজন 'ক্রেশে'র ছেলে-পিলেদের চার্জে। তাদের জন্য নতুন কোয়ার্টার তৈরী হয়ে গিয়েছে, এস ডি, ও, সাহেবকে দেখানো হল। আসলে দেখানো হল শিউচন্দ্রিকাকে; সে যে পাটনার উপরওয়ালাদের খবর দিয়েছিল যে মিল-মালিক বাড়ী তৈরী করবার মাল-মশলা নিয়ে ব্লাকমার্কেট করেছে, সে খবরও তাহ'লে এদের কানে গিয়েছে। আশ্চর্য!

—হাসপাতালের বাইরের টিনের শেডটাতেই তাহ'লে এখন ছেলে-পিলেদের জন্য 'ক্রেশে' হোক কি বলেন? গরম হবে বলছেন? আচ্ছা এখন তো শীতকাল আছে। তত দিনে দেখুন না নতুন ঘর তোলার ব্যবস্থা করা যায় কি না। 'ক্যান্টিন'-এর শেডটা একটু পায়খানার কাছে হয়ে যাচ্ছে না? ক্যান্টিন-এর ঠাকুরগুলো জুটোলেন কোথা থেকে ম্যানেজার সাহেব? আজকাল ঠাকুর-চাকর পাওয়া যা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে আর

বলবেন না। এমন মাস নেই যে মাসে একবার করে ঠাকুর পালায় না।···

যাক, এ সব পর্ব তো কোন রকমে শেষ হয়। শি[illegible]কা মনে মনে খুশী হয়ে ওঠে;—তবু এটুকুও তো হল এখনকার মত। কিছু দিন যেতে দাও, তার পর আবার এগুলোর সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে হৈ-চৈ আরম্ভ করলেই হবে।

সকলে মিলে এসে অফিস ঘরে বসে। ম্যাকনীল সাহেব গিয়েছে কলকাতায়, শনিবারের রেস খেলতে। আজ জয়নারায়ণ প্রসাদই মিলের একচ্ছত্রাধিপতি।

"এইবার ঐ চাকরি দুটো সম্বন্ধে আপনারা আপনাদের মতামত দেন।"

"ওর বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে গিয়েছিল না কি?"

"আমরা কি আর বসে আছি"—জয়নারায়ণ প্রসাদ [illegible]খানা ফাইল খুলে সকলের সম্মুখে রাখে, দেওয়ানী আদালতের নীল[illegible] ইস্তাহার ছাপানোর একখান চার পাতার সাপ্তাহিক পত্রিকা। "এই দেখুন লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দেওয়া জায়গাটা। পর-পর দু' সপ্তাহের কাগজে বেরিয়েছে এই বিজ্ঞাপন"······

"হাঁ, দু'খানি আবেদন-পত্র এসেছে এই চাকরি দু'টির জন্য। আজকে তাঁদের 'ইনটারভিউ'-এর জন্য ডাকাও হয়েছে। তাঁ[illegible] পাশের ঘরে অপেক্ষা করেছেন। তাঁদের ডাকি? কিছু বলবার আছে না কি, মন্ত্রিজী!"

"না।. আর যখন কোন দরখাস্তই নেই···"

'চাকরীতে কর্মচারীকে নিযুক্ত করবার সম্পূর্ণ অধিকার মিল-কর্তৃপক্ষের, কিন্তু আমরা একে অধিকার বলে মনে করি না, দায়িত্ব বলে মনে করি। ম্যাকনীল সাহেব কলকাতায় যাওয়ার সময়ও বলে

গিয়েছে যে এই সব মজুরদের 'ওয়েলফেয়ার সার্ভিস' সংক্রান্ত ব্যাপারে, সেওচণ্ডিকাকে কনসাল্ট করতে। আপত্তি থাকে তো বলবেন।"

শিউচন্দ্রিকার মাথায় তখন ঘুরছে রহমতের বিবির কথাটা। রহমতটা এখানেও বাইরে বসে রয়েছে। ক্রেশে কিম্বা ক্যান্টিনে তারা যাকে ইচ্ছা চাকরি দিক। কিন্তু সন্তানসম্ভবা মজুরাণীকে বরখাস্ত করে দেবে, সেটি হতে দিচ্ছি না। এ একটা মৌলিক দাবির প্রশ্ন। দু'মাসের মজুরি পূরো আদায় করতে হবে এদের কাছ থেকে। ইউনিয়ন অফিসে সে দরখাস্ত দিয়েছে।

বেয়ারা এক জন ভদ্রমহিলাকে পথ দেখিয়ে ঘরের ভিতর নিয়ে আসে।

"নমস্কার!"

"নাম কি?"

"মিনাকুমারী।"

"লেখা-পড়া কত দূর করেছেন?"

"হিন্দিতে সব কাজই চালাতে পারি।"

"হিসাব লিখতে পারেন? এক সের চালে কতখানি আন্দাজ ডাল রাঁধবেন?"

সব প্রশ্নেরই সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায়। "আচ্ছা বসুন আপনি। এইবার ক্রেশের চাকরিটার জন্য আবেদন-পত্র নেওয়া যাক, কি বলেন? বেয়ারা!"

আর এক জন ভদ্রমহিলাকে নিয়ে বেয়ারা ঘরে ঢোকে। "নাম?"

"রুক্মীদেবী"

"থার্মমিটার দেখতে জানেন? এরারুট কি করে তৈরী করবেন বলুন তো?"

"দু'জনই যোগ্য, কি বলেন সেক্রেটারী সাহেব?"

শিউচন্দ্রিকা দেখে যে দুজনেরই স্বাস্থ্য ভাল। ভদ্রঘরের মেয়ের মতই সাজ-পোষাক। কথাবার্তাও বেশ ভাল। সে কেবল জিজ্ঞাসা করে, "কবে থেকে এঁরা জয়েন করবেন?"

"এই পয়লা থেকে। পারবেন তো আপনারা? আচ্ছা তা হ'লে যান আপনারা। পয়লা থেকে, বুঝলেন? কালই চিঠি চলে যাবে আপনাদের নামে। হাঁ একটা কথা, বিজ্ঞাপনের সর্ত ভাল করে দেখে নিয়েছেন তো? মিল-কম্পাউণ্ডের ভিতর একই কোয়ার্টারে দু'জনকে থাকতে হবে। যত দিন চাকরি করবেন বিয়ে করা চলবে না। যদিই বা বিয়ে করেন, স্বামী কিম্বা ছেলেপিলে নিয়ে মিলের ভিতর থাকতে দেব না আমরা। বুঝলেন?"

ভদ্রমহিলা দু'জন ঘাড় নেড়ে বুঝিয়ে দেন যে কথাটা তাঁদের হৃদয়ঙ্গম হয়েছে। তারপর উপস্থিত সকলকে নমস্কার করে তাঁরা বেরিয়ে যান ঘর থেকে। শিউচন্দ্রিকার মত লোকেরও নজর এড়ায় না যে মিনাকুমারী নামের মেয়েটার তনু-দেহ দৃঢ় অথচ নমনীয়—ঠিক বেতের মত। আর রুকণী বলে মেয়েটার চোখের কোলে মোটা করে সুর্মা দেওয়া; চলে যাওয়ার সময় মেয়েটা যখন এস. ডি. ও. সাহেবের দিকে তাকিয়েছিল, তখন লক্ষ্য করেছিল শিউচন্দ্রিকা।

অভিমন্যু একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ। সে জানে যে তাকে এখানে ডাকা হয়েছে ভদ্রতার খাতিরে—শিউচন্দ্রিকার লেজুড় হিসাবে। তার মতামতের জন্য, এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার বা এস. ডি. ও. সাহেব কেউই বিশেষ উদ্‌গ্রীব নন। হয়তো তাকে ডাকা হয়েছিল, তাকে উপলক্ষ করে 'কেসর পাক'-এর চিনির কথাটা পেড়ে প্রথমেই শিউচন্দ্রিকাকে মুষড়ে দেওয়া।

প্রথমটায় তার এই ধারণাই হয়েছিল। মিনাকুমারী আর রুকণীকে দেখবার পর সে আসল কারণটা বুঝতে পারে। দু'টি মেয়েই

এখানকার অনাথালয়ের। 'কেসর পাক' দিতে গিয়ে কতদিন দেখেছে তাদের অভিমন্যু। এরাই অনাথালয়ের সারা গেরস্থালির কাজ দেখা-শুনো করে। মিনাকুমারী 'কেসর পাক'-এর হিসাব রাখে। এই রুকণী আর জয়নারায়ণ প্রসাদের সম্বন্ধে হাসি-মস্করা করতে শুনেছে সে অনাথালয়ের অকালপক্ক ছেলেদের,—ঐ যেগুলো হাফপ্যাণ্ট পরে ট্রেনে-ট্রেনে 'কেসর পাক' বিক্রি করে বেড়ায়! অথচ এস, ডি, ও, সাহেব কিম্বা এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার কেউই এমন ভাব দেখালো না যে এরা তাদের কারও পরিচিত! আহা, বেচারীরা চাকরী দু'টো পেলেই অভিমন্যু সন্তুষ্ট হয়। তাহ'লেই এক এদের অনাথালয়ের জীবন শেষ হতে পারে।···অনাথালয়ের নাম শুনলেই তো এখনই শিউচন্দ্রিকা আপত্তি করবে এদের নিযুক্তির সম্বন্ধে—যতই কেসর পাক বিক্রির বিষয় নিয়ে উপকৃত থাক না কেন ইউনিয়ন অনাথালয়ের কাছে। শিউচন্দ্রিকার মুখ বন্ধ করবার জন্যই বোধ হয় জয়নারায়ণ প্রসাদ ডাকবাংলাতে চিনির কথাটা তুলেছিল।···এই বুঝি শিউচন্দ্রিকা মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করে, বাড়ী কোথায়।

···যাক, শিউচন্দ্রিকা সে কথা জিজ্ঞাসা করেনি। অভিমন্যু নিশ্চিন্ত হয়। অনাথালয়ের মেয়েদের খারাপ বলে লোকে, কিন্তু সে তো এত দিন কেসর পাক নিয়ে যাতায়াত করছে অনাথালয়ে, কোন দিন কিছু খারাপ তো তার নজরে পড়েনি। 'কেসর পাক'-এর সাপ্তাহিক হিসাব-নিকাশ করবার সময় নম্র সংযত ব্যবহার দেখেছে মিনাকুমারীর।···

ঘর থেকে যাওয়ার সময় মিনাকুমারীর দৃষ্টিতে সাফল্যের উল্লাসের মধ্যেও অভিমন্যুর প্রতি ধন্যবাদ যেন ফুটে উঠেছিল; অন্তত সেই রকমই অভিমন্যুর মনে হয়।

এতক্ষণে শিউচন্দ্রিকা তার আসল কাজের কথা পাড়ে; রহমতের বিবির দরখাস্তের কথা। এই কথাটাই তার মনের মধ্যে ঘুরছে সকাল থেকে।

আজ জয়নারায়ণ প্রসাদ উদারতায় মুক্তহস্ত। শিউচন্দ্রিকা আজ যা বলে তাইতেই তিনি রাজী। "বিশ্বাস করুন মন্ত্রিজী, আমরা জানতাম না যে সে সন্তানসম্ভবা। বোধ হয় সর্দার-টর্দারের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে থাকবে। রামভরোসা সর্দার বলছেন যে ওর পিছনে লেগেছে? না না, সে ও-ধরণের লোক নয়। নিশ্চয়ই অন্য কিছু ব্যাপার ঘটে থাকবে। যাক গে, দু'মাসের মজুরির কথা বলছেন তো? আর তো কিছু না? লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার করে আপনাদের এই মিল। রহমতের বিবির দু'মাসের মজুরি দিতে আর ক'টাকা খরচ?···বলেন তো মন্ত্রিজী, তাকে এই 'ক্রেশে'তে দাইয়ের কাজ দিয়ে দিই। তার জন্যও তো লোক লাগবে। আরামের কাজ, বাঁধা মাইনে, ভাল চাকরি।"···

শিউচন্দ্রিকা মনে মনে হিসাব খতিয়ে দেখে। রহমতের বিবিকে এই চাকরিতে না ঢুকিয়ে বাকী মজুরি পাইয়ে দিলে ভবিষ্যতে সে মজুরণীদের মধ্যে ইউনিয়নের কাজে সাহায্য করতে পারে। আর যদি এই চাকরিতে ঢোকানো যায় তাহ'লে তার কাছ থেকে 'ক্রেশে' আর 'ক্যান্টিন'-এর কাজের আর চুরির অনেক খবরাখবর সব সময়েই পাওয়া যাবে।

"আচ্ছা সার, রহমতের বিবিকে জিজ্ঞাসা করে তারপর আপনাকে খবর দেব।"

শিউচন্দ্রিকা, অভিমন্যু, আর রহমৎ তিন জনই সাফল্যের তৃপ্তিতে ভরা মন নিয়ে মিল-গেটের বাইরে আসে। এস, ডি, ও সাহেব টেনিস খেলবার জন্য ভিতরেই থেকে যান। সে সম্বন্ধে মন্তব্য করাও আজ আর কেউ প্রয়োজন মনে করে না।

"তোমার চিঠি পেয়েছি। আজ সন্ধ্যার পর অনাথালয়ে যাব হেঁটে। রুকণী আগেই চলে যাবে রিক্‌শাতে। দেখা ক'র।

"তোমার মিনাকুমারী"

১৯-২-৪৭

এ দলিলখানাও শিউচন্দ্রিকা পেয়েছিল অভিমন্যুর ঝোলার মধ্যে থেকে। প্রথমে বুঝতেই পারেনি ব্যাপারটা।······মেয়েলি হাতের লেখা।

সযত্নে বাঁচিয়ে তুলে রেখেছিল এখানাকে অভিমন্যু। ভৃগুর গণনার কাগজখানার মতই এখানিরও মূল্য ছিল তার কাছে। অথচ এর কথা ঘুণাক্ষরেও কোন দিন বলেনি অভিমন্যু কারও কাছে। সময়ে বললে হয়ত তার জীবনের রূপ বদলে যেতে পারত। আগে এটা ছিল তার গোপন কথা; একান্ত আপন কথা; যার চিঠি তাকে ছাড়া আর বলা চলে না। পরে যেদিন এই মধুর গোপন কথাটা এক কুৎসিত নগ্ন রূপ নিয়েছিল এক অপ্রত্যাশিত পরিবেশে, সেদিন সে এই চিঠিখানা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের জবাবে দিতে পারত। ঐ অবস্থায় পড়লে ঐ রকম পাল্টা জবাব দিয়ে জয়নারায়ণপ্রসাদের মুখ বন্ধ করতে পারত হয়ত শিউচন্দ্রিকা। কিন্তু অভিমন্যু অন্য ধাতু দিয়ে গড়া। পার্টির ভাল-মন্দর মানদণ্ড ছাড়াও অন্য মাপকাঠির খোঁজ সে রাখে। তার সূক্ষ্ম শালীনতাবোধ তাকে বিরত করেছিল আত্মরক্ষার অস্ত্র হিসাবে চিঠিখানা ব্যবহার করা থেকে। সে তখন তার পৌরুষের অপমানে—ভালবাসার অপমানে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল; উত্তর দিত কি করে?

শিউচন্দ্রিকা ভাবে যে অভিমন্যু সময়ে বলেনি কেন এ কথা।··· শিউচন্দ্রিকার ক্ষুরধার বুদ্ধি আছে কিন্তু দরদী মন নেই। ক্ষুর দিয়ে চুল চেরা যায়, কিন্তু কুঁচবরণ কন্যের মেঘবরণ চুল নজরে পড়বার পর তবে তো সেটাকে চেরার প্রশ্ন ওঠে।

এখন শিউচন্দ্রিকা সব বোঝে। অভিমন্যুর জীবনের একটা গোপন কথার সন্ধান সে পেয়েছিল। তাও নিজে নয়; যার কাছ থেকে সে আশা করেনি এমন লোক চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার পর। ক্ষতি তার আগেই হয়ে গিয়েছে; পার্টির সম্মান ধুলায় লুটিয়ে পড়েছে। হয়ত তখন এই চিঠিখানার কথা শিউচন্দ্রিকা জানতে পারলে, সেই সময়ের অস্বস্তিকর পরিস্থিতিটাকে একটি চিরাচরিত সামাজিক বন্ধনের পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারত সে। উৎসবের উপহার ছিল যার প্রাপ্য, সে পেয়েছিল নির্বাসনের দণ্ড।

ভাগ্যকে দোষ দেয়নি অভিমন্যু সে সময়ও। অস্পষ্ট ভাবে সে হয়ত বুঝেছিল যে তার জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি যা অনেক কাল আগেই লেখা হয়ে গিয়েছে, তারই দিকে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে চলছে সে। এর মধ্যে ভাগ্যের দোষ-গুণের প্রশ্ন অবান্তর। যে জিনিসের যা ধর্ম; তার মধ্যে ভাল-মন্দর প্রশ্ন ওঠে কোথায়?

রুকণী আর মিনাকুমারী চাকরিতে ভর্তি হওয়ার দিন কয়েক পর শিউচন্দ্রিকা জানতে পারে যে তারা অনাথালয়ের মেয়ে। তখন আর কিছু করবার ছিল না। সে নিজে সম্মতি দিয়েছে চাকরিতে তাদের নিযুক্ত করতে। ঐ মেয়ে দু'টি যদি এসিষ্টেণ্ট ম্যানেজারের হাতের মুঠোর লোক না হত, তাহলে হয়তো তাদের ইউনিয়নে টেনে আনা যেত; বিলক্ষণ ভুল করে ফেলেছে সে। আর সব চেয়ে বড় কথা, মজুররা সকলেই জানে যে এই মেয়েদের নিযুক্তির ব্যাপারে মন্ত্রীজির মতামত নেওয়া হয়েছে। তারা কি ভাবছে! অনাথালয়টাকে অধিকাংশ মজুর প্রায় গণিকালয় বলেই ভাবে। তাও আবার যে-সে ধরণের নয়,— এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার চালায়, ম্যানেজার আর হাকিমদের জন্য; মিলের অন্যান্য বড় চাকুরেরাও পাত-কুড়ানো এঁটোটা-কাঁটাটা পায়।···দেখিস না, মিলের ভিতর কোয়ার্টার করে দিয়েছে। কেন বাপু, অনাথালয়

খুলেছ, বর জুটিয়ে দাও মেয়েদের, বিয়ে দিয়ে দাও যেখানে পার। তা নয়! অনাথালয়ের ছোট ছেলেদের বিভাগটা পর্য্যন্ত অতি বদ্। ঐ এঁচড়ে পাকা ছেলের দল, ফৌজের ব্যাণ্ড বাজিয়ে যখন চাঁদা তুলতে যায় সদরে, তখন কঞ্জুস মাড়োয়ারীগুলোও হেসে ঝনাঝন্ টাকা ফেলে শালুর কাপড়খানার উপর। মন্ত্রীজি অনাথালয়ের খেলাপে যেতে পারে না কেন জানিস তো? ঐ ছেলেগুলোই অভিমন্যুর কেসরপাক বিক্রি করে ট্রেণে, তাই। খাসনি 'কেসরপাক'? মোদকের মত খেতে; নিশ্চয়ই ভাং দেওয়া থাকে ওতে।...আর লক্ষ্য করেছিস, ঐ পটের বিবি দু'জনের রোজ মিল থেকে অনাথালয়ে যাওয়া চাই,—সন্ধ্যার পর।...

এ নিয়ে শিউচন্দ্রিকার কথা হয়েছিল অভিমন্যুর সঙ্গে। অভিমন্যু বলে যে রুকণী আর মিনাকুমারী সন্ধ্যা বেলা দু'ঘণ্টা করে অনাথালয়ে কাজ করে। দশ টাকা করে তার জন্য মাইনে পায় অনাথালয় থেকে, আর যাতায়াতের রিকশা-ভাড়া। ছোট বেলা থেকে সেখানে মানুষ। কত ছেলেমেয়ে অনাথালয়ে আসে-যায়, ওরা কিন্তু চিরকাল থেকে গিয়েছিল। এখনও রোজ সাঁঝে হিসাব লেখে মিনাকুমারী। রুকণী তদারক করে রান্না-বাড়ীর ব্যবস্থার আর ছেলেপিলেদের খাওয়া-দাওয়ার। জয়নারায়ণ প্রসাদই করিয়ে দিয়েছে এই কাজ। আহা, করুক বেচারীরা দু'পয়সা উপরি রোজগার।...না, না, শিউচন্দ্রিকা তুমিও সাধারণ বাজারের লোকের মত অনাথালয়ের মেয়েদের সম্বন্ধে একটা যা-তা ভেবে নিও না। আমাকে কেসরপাক নিয়ে কত সময় যেতে হয় ওখানে। দেখছি তো! তোমার-আমারই মত তাদেরও আত্মমর্য্যাদা-বোধ আছে। রক্ত-মাংসের শরীর; ভুল-ত্রুটি সকলেরই হতে পারে; তোমারও হতে পারে, আমারও হতে পারে। কিন্তু তাই বলে একেবারে ঢালা রায় দিয়ে দেওয়া যে অনাথালয়ের সব মেয়েই খারাপ, এ তোমার মত লোকের শোভা পায় না। একটা সাধারণ লোকের মত রটানো কথায় হুজুগে পড়ে সায় দিও না।

এমন করে শিউচন্দ্রিকাকে হক কথা শোনাবার সাহস এক অভিমন্যুরই আছে। একটু উত্তেজিত হয়ে পড়লে সে নিজের কথার মধ্যে একেবারে নিজেকে ঢেলে দেয়।

শিউচন্দ্রিকা ভাবে যে এত উত্তেজিত হয়ে উঠল কেন অভিমন্যু, একটা সামান্য অনাথালয়ের কথায়। নিশ্চয়ই তার মনের কোন স্পর্শকাতর স্থানে আঘাত লেগেছে। এ তো আগে ছিল না। পূর্বে কত সময় নিজেই অনাথালয় নিয়ে ঠাট্টা করেছে, বলেছে কেসর-পাক নিয়ে ওখানে যেতে লজ্জা করে; মনে হয়, পৃথিবীশুদ্ধ লোক তাকিয়ে দেখছে তার দিকে।

পরিবর্তনটা এসেছিল ইদানীং।

অভিমন্যুর দৃষ্টি ছিল ভাবুকের, মন ছিল কবির। তার ব্যবহারে ছিল খানিকটা খামখেয়ালী ভাব। বেলা বাড়ার সঙ্গে কোন সময় যেন নিখুঁত সাদা স্থলপদ্মে গোলাপী রঙের আভা লেগেছে। দৃষ্টি হয়ে এসেছে গভীর। একটা কিসের যেন ভার পড়েছে হাল্কা মনটার উপর। মেপে কথা সে কোন দিন বলতে পারে না বলেই হঠাৎ ভারিক্কে হয়ে ওঠেনি সে। তবে তার মন বলে, সে এত দিনে এমন একটা জিনিষের সন্ধান পেয়েছে, যা আঁকড়ে তার উড়নচড়ে মন চিরকাল স্থির থাকতে পারে। অভিমন্যু বোকা নয়; এর আগেও যখনই সে এক-একটা নতুন হুজুগের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে, তখনই তার মনে হয়েছে যে, সে ঐ নিয়েই সারা জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে; কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই তার মন হাঁফিয়ে উঠেছে। তার মনের এই ধারাটা তার চাইতে কেউ বেশী জানে না। তবু অভিমন্যুর মনে হয়েছে যে এবারকার জিনিষটা কেবল একটা সাময়িক হুজুগ মাত্র নয়। এর মাদকতা অনেক মধুর, আকর্ষণ অনেক তীব্র, আর নেশা বোধ হয় চিরস্থায়ী। সে আশ্চর্য্য হয়নি। ফল্গুতেও ভাদরে বান ডাকে তা সে জানে।

সেই 'ইনটারভিউ'এর পর কত দিন তার দেখা হয়েছে মিনা-কুমারী আর রুকণীর সঙ্গে অনাথালয়ে। লোকে যতই নিন্দা করুক, অনাথালয়ের ছেলেমেয়েদের উপর অভিমন্যুর ছিল একটা সহজাত সহানুভূতি। সেইটাই যেন একটু বেশী ভাবে অনুভব করেছিল মিনা-কুমারীর বেলা। বেশ শান্ত সংযত ভাব মেয়েটির। ভারি গোছাল; 'কেসরপাক'-এর হিসাব-নিকাশ করবার সময় এর মনে মনে প্রশংসা করত অভিমন্যু প্রতি সপ্তাহে। অভিমন্যুর বোধ হয় মিনাকুমারীকে বেশী ভাল লেগেছিল পাশাপাশি তার বন্ধু রুকণীর সঙ্গে তুলনা করবার সুযোগ পেয়ে। রুকণী ছিল চটুলা, আর হয়তো একটু গায়েপড়া গায়েপড়া ভাবের। চঞ্চল কর্মব্যস্ততার মধ্যে খিল-খিল করে হেসে ফেটে পড়ত কথায়-কথায়।

রুকণী ভালবাসত ক্ষমতা, আর অন্যকে একেবারে হাতের মুঠোয় রাখার আনন্দ। মিনাকুমারী ছিল তার অনুগত। সে নিজেকে লুকিয়ে রাখতেই ভালবাসে। ঠিক লতাগাছের মত তারও দাঁড়াতে হলে একটা আশ্রয়ের দরকার হয়। রুকণীর তাঁবেদারি সে দ্বিধাহীন অন্তরে মেনে নিয়েছিল। তাই সে হতে পেরেছিল রুকণীর অন্তরঙ্গ বন্ধু। রুকণীর সঙ্গে কেসরপাকের সূত্রে দেখা হওয়ার কথা নয়; কেন না, সন্ধ্যার পর দু'ঘণ্টার মধ্যে তাকে অনেক কাজ করতে হয় অনাথালয়ের। তবু রুকণী এর মধ্যেও সময় করে নিয়ে এসে, দু'টো হাসির কথা বলে যেতে ছাড়ত না অভিমন্যুর সঙ্গে, যেদিন সে যেত কেসরপাকের হিসাব করাতে।

মিলে চাকরি নেওয়ার আগে অভিমন্যুর সঙ্গে কথাবার্তায় মিনাকুমারীর ছিল একটা স্বাভাবিক সঙ্কোচের বাধা। কবে সে বাধা কেটে গিয়ে একটা সহজ প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে তা তারা বুঝতেও পারে না। আঁকড়ে ধরতে চায় মেয়েটি একটি আশ্রয়।

তার মা-বাপের পরিচয় সে জানে জানে না। অনাথালয়ের পুরা
খাতায় সে দেখেছে যে, তাকে পাওয়া গিয়েছিল বলীরামপুর-জং
ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। সেই যে এসে পড়েছিল এখানকার অনাথাল
আর কোথাও যেতে পারেনি। কেউ তার খোঁজ নিতে আসেনি
শুক্‌নো রুটিন-বাঁধা জীবন এখানকার, থাকতে থাকতে সয়ে গিয়েছি
স্বাভাবিকই মনে হত এটাকে। সে কম দিনের কথা হল না, তখ
অনাথালয়ের উত্তরের দালানটা তৈরী হয়নি। তার পর কত লে
এল-গেল। কত মেয়ের বিয়ের যোগাড় করে দেওয়া হল। ঐ
মিলের গেনা সর্দারের স্ত্রী, সে তো অনাথালয়ের মেয়ে। ব
মেয়ের পাঞ্জাবে বিয়ে দিয়ে হাজার-হাজার টাকা রোজগার কর
জয়নারায়ণ প্রসাদ। সব খবরই রাখে মিনাকুমারী! এখানকা
একঘেয়ে জীবনের মধ্যে বৈচিত্র্য আনে নিত্য-নূতন ছেলে-মে
যুবতীর দল, যারা এখানে আসে, আবার চলে যায়। তারাই থা
উত্তরের দালানে। বিচিত্র তাদের অভিজ্ঞতা, অদ্ভুত তাদের জীবনে
পিছল পথের কাহিনী।

অনাথালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ যে তার আর রুকণীর বিয়ে দেওয়ানো
চেষ্টা করেননি, বাইরের লোকে তার নানা রকম কদর্থ করে
এ কথা মিনাকুমারী বা রুকণী কেউ বোধ হয় হলফ্ নিয়ে বল
পারবে না যে পাবলিকের তাদের সম্বন্ধে সন্দেহের কোন ভিত্তি
নেই। এখানকার পরিবেশে কারও সে কথা বলার সাহস থাকতে
পারে না। এক-আধ বার এরই মধ্যে তারাও দমকা হাওয়ার ঝাপটা
মধ্যে পড়ে গিয়েছে জীবনে। তবে তার জন্য দায়ী তারা নিজেরাই
অনাথালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের কোন হাত ছিল না তার মধ্যে। লো
যা বলে বলুক। তাদের চাইতে বেশী তো আর কেউ জানে না
তবে তারা আসল কথাটা জানে, তাদের বিয়ের সম্বন্ধে অনাথালয়ে

কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার। জয়নারায়ণ প্রসাদরা এ কথা বোঝে যে মিনাকুমারী আর রুকণী চলে গেলে অনাথালয়ের কাজ সুশৃঙ্খল ভাবে চলা সম্ভব নয়। ঝানু লোক জয়নারায়ণ প্রসাদ। সে জানে যে অনাথালয়ের হাড়-বজ্জাত মুনীমজী, দারোয়ান, দারোয়ানের স্ত্রী আর ঐ ব্যাণ্ড-মাষ্টারটা মিলে সব চুরি করে ফতুর করে দেবে যদি রুকণী আর মিনাকুমারী দেখা-শুনা না করে। তা'হলে আর চাঁদার পয়সা হিসাবের খাতায় উঠবে না, চালের বস্তা চালান হয়ে যাবে রান্নাঘরের পিছনের খিড়কির দুয়োর দিয়ে। অনাথালয়ের যাতে ক্ষতি না হয় সেই জন্যই এসিষ্টেণ্ট ম্যানেজার সাহেব জুট-মিলে মিনাকুমারীদের চাকরি জুটিয়ে দিয়েছেন। একবার করে সন্ধ্যার সময় এসে দেখা-শুনো করে গেলেই, মুনীমজীর দলটা একটু রয়ে-সয়ে চলবে। এই মেয়ে দুটিকে পঙ্কিল পথে নিয়ে যাওয়ার আস্কারা দেওয়া অনাথালয়ের স্বার্থের বিরুদ্ধে। সেই জন্য অনাথালয়েব সঙ্গে যাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় তারা সকলেই জানে, এখানকার কার্য-কলাপের আঁধার অধ্যায়ের নায়িকা, যারা দু'-চার দিনের জন্য আসে তারাই; এখানকার স্থায়ী অধিবাসীরা কোন কালেই নয়।

শিউচন্দ্রিকার মত অন্তরঙ্গ বন্ধুকে এ কথা বোঝাবার চেষ্টা করতে পারে অভিমন্যু, কিন্তু সাধারণ মজুরদের এ কথা কে বিশ্বাস করাতে পারবে?

বড় হওয়ার পর মিনাকুমারী প্রতিদিন অনুভব করেছে যে অনাথালয়ে থাকলে পরিচয় হয় কেবল জগতের আঁধার আর উষর পিঠটার সঙ্গে। স্নেহ-ভালবাসা, আদর-আবদার এ সবের জায়গা কোথায় এখানকার আবহাওয়ায়? স্বার্থের রুক্ষতার ছোঁয়াচ লেগে সব শুখিয়ে যায় এখানে। নিজের মা-বাবা যে মেয়েদের ভালবাসতে

ভুলেছে, তাদের মনের স্নেহ পাওয়ার জায়গাটুকু থেকে যায় একেবারে খালি। আপন বলতে যাদের জগতে কিছু নেই, কেউ নেই, বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা চায় এক জন জীবনের সাথী। তাই চেয়েছিল মিনাকুমারী। এ পৃথিবীর উপর তার বিশ্বাস নেই। এর ঝড়-ঝাপটা যাকে অনাথালয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য করে, তার সে বিশ্বাস থাকতে পারে না। তার বুভুক্ষু মন চায় তার জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে গভীর ভালবাসা, এত গভীর যে তার রুক্ষ বাল্য-জীবনের সব বাকী-বকেয়া উসুল করে নেওয়ার পরও যেন পুঁজিতে হাত না পড়ে। সে চায় একটা নির্ঝঞ্ঝাট জীবন; বেড়া দিয়ে ঘেরা ছোট্ট একখান নিকানো অঙ্গন; উঠানের তুলসীমঞ্চটার পাশে একটা উলঙ্গ শিশু খেলা করছে। এই অঙ্গনটা হবে তার একান্ত আপন; নিজেকে নিঃশেষ করা দরদ দিয়ে সে গড়ে তুলবে এই নীড়। সে নিত্য-নূতন চমক চায় না, চায় গেরস্থালীর জীবনের নিবিড় সুখ। তার সাথী নিজের দেহের প্রাচীর আর বাহুর শক্তি দিয়ে আগলে থাকবে তাকে বাইরের ঝড়-ঝাপটা থেকে। অধিকাংশ মেয়ের মত এই ছিল তার কাম্য। সাধারণ মেয়েছেলের মত মিনাকুমারীর মনটাও ছিল কিন্তু অতিমাত্রায় হিসাবী। অনাথালয়ের হিসাবের খাতা লিখতো বলে নয়; স্বভাব থেকেই। ভারী সাবধানী মানুষ সে। না ভেবে-চিন্তে এক পা এগোয় না। নিছক ভাবের আবেগে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে পারে না। এটুকু সাংসারিক জ্ঞান তার হয়েছে।

এরই মধ্যে, তার জীবনে এল আপনভোলা অভিমন্যু। মিলে চাকরি নেবার আগেই মিনাকুমারীর ভাল লেগেছিল এই লোকটির অকৃত্রিম সৌজন্য। এই ছোট শহরের প্রতিটি লোক, এমন কি বাড়ীর মেয়েরা পর্য্যন্ত শিউচন্দ্রিকা আর অভিমন্যুর নাম শুনেছে! বলীরাম-পুরের লোকের গল্পের বিষয়-বস্তু মাত্র দু'টি—মিল আর অনাথালয়।

রসের খোরাক জোগায় অনাথালয়ের মেয়েরা, আর উদ্দীপনার যোগান দেয় মিলের মজুররা। প্রত্যহ লেগে আছে তাদের মিটিং; ময়দানের বড় মিটিং, ভাঙা হাটের খুচরো মিটিং, ছুটির সময়ের 'মিল গেট-এর ছোট মিটিং। এ ছাড়া কারণে অকারণে মিছিল, কত রকমের দিবস-পালন, হরতালের হিড়িক, মজুরদের ড্রিলের ক্লাস, তাড়ির দোকানের কোলাহল, মজুর-ব্যারাকের কীর্তন আর রক্ত গরম-করা গানের সমারোহ, থানা-পুলিশ, নিত্য-নূতন চাঞ্চল্যের অহোরাত্র উৎসব। তাই মিনাকুমারীও চিনত শিউচন্দ্রিকা আর অভিমন্যুকে। অনাথালয়ে মুনীমজী আর জয়নারায়ণ প্রসাদের কাছে কত দিন শুনেছে যে এরা দু'জন মজুরদের ঠকিয়ে, নিজেদের পকেট ভরবার জন্য এখানে এসে জুটেছে; তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে কিছু টাকা রোজগারের পর এক দিন উড়ে যাবে ফুড়ুৎ করে।

একথায় মিনাকুমারীরা বিশ্বাস করেনি কোন দিন। বলীরাম-পুরের আর দশ জন লোকের মত মীনাকুমারীও এদের শ্রদ্ধা করত, মনে মনে প্রশংসা করত। তখনও ভালবাসার প্রশ্ন ওঠেনি তার মনে। সেটা উঠল কেসরপাক নিয়ে অভিমন্যুর সঙ্গে দেখা হওয়ার অনেক পর। মিনাকুমারী আর রুকণীর মনে একটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, এই সব সন্ন্যাসী গোছের লোকদের শিষ্যরা ছাড়া আর কেউ নাগাল পায় না; সব কিছুর মধ্যে থাকলেও না কি শিউচন্দ্রিকা আর অভিমন্যুর এমন একটা আলগা আলগা ভাব আছে, যার জন্য কেউ তাদের মনের কাছেও ঘেঁষতে পারে না। কিন্তু কাজের সূত্রে অভিমন্যুর সান্নিধ্যে এসে মিনাকুমারীর ভুল ভাঙ্গে। ভয় আর সঙ্কোচ কেটে যায়। অভিমন্যুর সহজ প্রাণখোলা ব্যবহারে প্রতিবেশের উপর ঔদাসীন্য নেই, অনাবিল উৎসাহের অভাব নেই তার কোন বিষয়ে। সে হেসে কথা বলতেও জানে; মধুর ব্যবহারে পরকে আপন করে নিতে অভিমন্যুর এক মুহূর্তও দেরী

লাগে না; প্রথমটায় মিনাকুমারী আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল ত্যাগী সন্ন্যাসীটির মধ্যে অপ্রত্যাশিত ভাবে এই সব দেখে। আবিষ্কারের আনন্দ নিয়ে সে ক্রমে জানতে পারে যে অভিমন্যু কোন লোককেই দূরে ঠেলে দেয় না, দরদী মনকে তো নয়ই।

যে তার সম্পর্কে আসে তারই উপর অভিমন্যুর মন হালকা পরশ রেখে যায়। মিনাকুরারীর উপর রঙের পরশ এত হালকা ভাবে লাগেনি। অনেককে কেবল দূর থেকেই ভাল লাগে; কিন্তু মিনাকুমারী বুঝেছিল যে অভিমন্যুকে দূর থেকে তো ভাল লাগেই, কাছ থেকে আরও ভাল লাগে।

এই ভাল লাগালাগির পথে, অন্য লোক যেখানে হেঁটে চলে, অভিমন্যু সেখানে ছুটে চলে, চোখ বুজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পক্ষীরাজের পিঠে সওয়ার হয়ে যে রাজপুত্তুর মেঘের মধ্যে দিয়ে উড়ে চলে, তার কি মাটিতে হোঁচট খাওয়ার কথা মনে আসে? মনের নদীতে বান ডেকেছে; ছ'কূল ভাসিয়ে নিয়ে যাবেই যাবে। তাতে বাধা দেবার কে মনের রাজ্যের বাইরের লোকরা? আর বাইরের লোকরা এ নিয়ে মাথা ঘামায়ওনি।

শিউচন্দ্রিকা পার্টির ভাল-মন্দর ব্যাপারে মাথা না ঘামিয়ে পারে না। সেই যেদিন এস, ডি, ও সাহেবের সম্মুখে এসিষ্টেণ্ট ম্যানেজার খোঁটা দিয়েছিল তাদের কেসরপাকের চিনির সম্বন্ধে সেই সেদিন থেকেই শিউচন্দ্রিকা ঠিক করে নিয়েছিল যে এই পর্ব যত শীঘ্র সম্ভব শেষ করতে হবে। মজদুর ইউনিয়নের সঙ্গে স্থানীয় অনাথালয়ের ব্যবসায়িক সম্বন্ধ মজুররা কি চোখে দেখে, তা শিউচন্দ্রিকা বেশ বোঝে। সে জানে যে তার ব্যক্তিত্বের জোরেই মজুরদের মধ্যে এই বিষয়ের কাণাঘুষোটা একটু কম আছে।

সেই জন্য শিউচন্দ্রিকা উঠে-পড়ে লাগে ইউনিয়নের আয় বাড়ানোর

জন্য। ইউনিয়নের কিছু কাজ চোখে আঙুল দিয়ে মজুরদের দেখাতে পারলে তবে না এর উপর মজুরদের আস্থা বাড়বে। এবারে তোমাদের দু-দু'টো দাবি মিল কর্তৃপক্ষ মেনে নিয়েছে—'ক্রেশে' আর 'ক্যান্টিন'। তোমাদের ইউনিয়ন না থাকলে কোন দিন হত? ছেলে পিলে হওয়ার আগে এক মাস আর পরে এক মাস বসে মজুরি দেওয়াচ্ছে তোমাদের এই ইউনিয়ন।

ও তো মন্ত্রীজি সমস্তিপুর মিলেও হয়েছে।

ভাল করে খোঁজ নিয়ো। হয়েছে ঐ নামেই। কাজে কত দূর কি হচ্ছে তাই দিয়ে না মিল-মালিকের শয়তানির যাচাই করতে হবে তোমাদের।

ঠিক বলছে মন্ত্রীজি। রহমতের বিবিকে ভাল কাজ পাইয়ে দিয়েছে। দাইয়ের কাজ, মিলে।

আরও অনেক [illegible]ব দরখাস্ত গিয়েছে পাটনায়। কেবল দরখাস্ত নয়, সঙ্গে সঙ্গে কড়া করে লিখে দেওয়া হয়েছে, দাবি না মেনে নেওয়া হলে কি করা হবে। বেশী মেম্বর না হলে সরকার তোমাদের কথা শুনবেই না, তোমাদের দরখাস্ত পড়বেই না। আর শুনেছ তো, দালালদের দিয়ে আর একটা লোক-দেখান ইউনিয়ন খোলবার চেষ্টা করছে জয়নারায়ণ প্রসাদ? এই বলে দিলাম, তোমরা যদি নিজেদের ইউনিয়নের চাঁদা-দেওয়া মেম্বর না হও, তা'হলে এক দিন কলেক্টর সাহেবকে দিয়ে বলিয়ে দেবে ম্যাকনীল সাহেব যে, ঐ দালাল ইউনিয়নটারই মেম্বর বেশী, সেইটাই আসল ইউনিয়ন। শীগগিরই ঝটপট্ সবাই মেম্বর হয়ে যাও। নিয়ে যাও কালু সর্দ্দার মেম্বর করবার রসিদ-বই। তাঁত-ঘরের প্রত্যেকটি লোককে মেম্বর করা চাই। আলবাৎ দেবে যেতে মিলের মধ্যে রসিদ-বই নিয়ে। তাঁত-ঘরের অধিকাংশ মজুর মুসলমান বলে তুমি বেশী মেম্বর করতে পারবে না বলছ। বাজে ছুতো দেখিও না! রহমৎ তো আছে

তোমার সঙ্গে। না, না, কোন ওজর শোনা হবে না কালু সর্দার; এই রাখ চারখানা মেম্বরী রসিদ-বই। এখানে দস্তখত কর, এই ডান দিকে। কেউ চাঁদা বলে আলাদা কিছু দিলে নেবে বৈ কি। তার জন্য কিন্তু এই আলাদা চাঁদার রসিদ দেবে।...

ইউনিয়নের সদস্য-সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে।

শিউচন্দ্রিকা মনে মনে হিসাব করে যে কেসরপাক তৈরী করা তুলে দিলে, অভিমন্যু সপ্তাহে পুরো এক দিন করে সময় বেশী পাবে পার্টির কাগজ আর বই-টই বেচবার জন্য। তার জন্যও কিছু আয় বাড়বে। চলে যাবে এক রকম করে ইউনিয়নের খরচ। যেমন করে হোক চালিয়ে নেবে সে...আর গোটা কয়েক ইউনিয়নের দরকারী জিনিষ কিনবার পরই, শিউচন্দ্রিকা তুলে দেবে কেসরপাকের পাট। কত জিনিসের তাদের দরকার এখনও,—মিটিংয়ের জন্য সতরঞ্চি, একটা বড় লণ্ঠন, অফিস-ঘরের জন্য আলমারী, একটা বড় সাইনবোর্ড, গোটা কয়েক টিনের ভেঁপু, ফ্যাক্টরী আইন সংক্রান্ত দু'খান দরকারী বই, আরও কত কি। ছেড়ে দেব বললেই কি অমনি ছেড়ে দেওয়া যায় কেসরপাক তৈরী? অনেক হিসাব করে চলতে হয় শিউচন্দ্রিকাকে।

হতে-করতে বছরখানেক কেটে যায়।

তার পর এক দিন শিউচন্দ্রিকা হুকুম দিয়ে দেয়, অভিমন্যু আর এ মাস থেকে চিনি এনো না—'কেসরপাক' এর জন্যে।

এ দুর্দিন অভিমন্যুর কাছে অপ্রত্যাশিত নয়। তবু হতাশায় তার মন মুষড়ে পড়ে। সাজা প্রত্যাশিত বলে কি ফাঁসির রায় বেরুবার পর খুনী আসামী হাসে? প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় সে যায় অনাথালয়ে, আগামী সপ্তাহের 'কেসরপাক' দিতে, আর গত সপ্তাহের দেওয়া 'কেসরপাকের দামটা আনতে। শনিবারটা আর আসতেই চায় না। ঐ দিনের ঐ সময়টুকুর প্রতীক্ষায় সারা সপ্তাহ দিন গোণা তার অভ্যাস

হয়ে গিয়েছে, গত দেড় বছরের মধ্যে। এই শুভ মুহূর্তের প্রতীক্ষা তার মনে জুগিয়েছে একটা মধুর উত্তেজনার রস, জ্বালিয়েছে তার মন্থর জীবনে অনভ্যস্ত উৎসাহের আগুন, রঙীন করে তুলেছে তার কুশ্রী কোলাহলমুখর আবেষ্টনী। এই মিষ্টি আলো-আঁধারি প্রতীক্ষার উপর শিউচন্দ্রিকা হঠাৎ রূঢ় হাতে যবনিকা টেনে দিচ্ছে।

অভিমন্যুর সন্দেহ হয়,—শিউচন্দ্রিকা তা'হলে বোধ হয় তার মনের মধুর গোপন কথাটার সন্ধান পেয়ে গিয়েছে। সেই জন্যই বোধ হয় সে এই অধ্যায় শেষ করবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে। জ্ঞানী-মূর্খ শিউচন্দ্রিকা। মনের সূক্ষ্ম জটিল গ্রন্থির বালাই নেই তার। তাই সে জানে না যে এ গ্রন্থি যত জোর করে খুলতে যাবে, তত আরও জট পাকিয়ে যাবে। গুড়ের মধ্যে মাছি আরও জড়িয়ে পড়বে।…

সেই জন্যই এই 'কেসরপাক' তৈরী বন্ধ করার অনুরোধকেও অতি আকস্মিক বলে মনে হয়েছিল, অভিমন্যুর।

অনুরোধ? না আদেশ? তার মনটা কি বলীরামপুর মজদুর ইউনিয়নের সেক্রেটারীর হাতের এক তাল কাদা না কি? সেটাকে দিয়ে যেমন ইচ্ছে পুতুল তৈরী করবার অধিকার মন্ত্রীজিকে কে দিয়েছে?

এই খবরে অভিমন্যুর চাইতেও অভিভূত হয়ে পড়ে বেশী মিনাকুমারী। এমনিই সে কম কথা বলে। সেদিন নিজেকে নিজের মধ্যে আরও গুটিয়ে নেয় শামুকের মত। কেসরপাকের [illegible]ষ হিসাবে ভুল করে ফেলে। কানে ভেসে আসে অভিমন্যুর ভাঙ্গা-ভাঙ্গা স্বরের টুকরোগুলো। শেষ পর্যন্ত চোখের জলে হিসাবের খাতার কালির আঁচড়গুলো আর দেখা যায় না।…মিলের মধ্যে তোমাদের কোয়ার্টার। সেখানে তো আমরা যেতে পারি না।…দেখা না হলেও এক জায়গাতেই আমরা আছি!…রহমতের বিবিই তো 'ক্রেশে'র দাই। তারই মারফৎ খবরাখবর দেওয়া-নেওয়া চলবে। কিন্তু রহমতের বিবিকে বলে দেবে যে খবদ্দার! শিউচন্দ্রিকা

যেন ঘুণাক্ষরেও এ কথা জানতে না পারে।···লক্ষ্য করছে মিনা, ছেলের আর মেয়ের মনের মধ্যে কত তফাৎ? আমি এ সব কথা ইঙ্গিতেও জানাইনি শিউচন্দ্রিকাকে; কিন্তু তোমার বন্ধু রুকণীকে মনের সব কথাই তুমি বলেছ।···তোমরা দুই বন্ধুতে রিক্‌শা চড়ে রোজ যখন আসবে অনাথালয়ে সেই সময় চোখের দেখা দেখে নেওয়া যাবে মাঝে-মাঝে।···

অভিমন্যুর গলার স্বর ভারি হয়ে আসে। জোর করে মুখে হাসি এনে, পুরুষের মনের জোর মেয়েদের চেয়ে কত বেশী তাই দেখাতে চেষ্টা করে। কখন যেন মিনাকুমারীর নরম আঙ্গুল ক'টা এসে পড়ে অভিমন্যুর শক্ত মুঠোর মধ্যে।

হঠাৎ রুকণী এসে পড়ায় দু'জনেই হাত সরিয়ে নেয়। রুকণী দেখেও দেখে না;—এত লুকোচুরির কি দরকার ছিল তার কাছে? অন্য দিনের মত আজও সে ক্ষণিকের উছল হাসিতে ঘর মাতিয়ে তখনই বেরিয়ে যায়।—"ভাঁড়ারের ছিষ্টি কাজ বলে আমার পড়ে রয়েছে এখনও।"···

তারপর মাঝে-মাঝেরহমতের বিবির মারফৎ খবরাখবরের আদান-প্রদান চালিয়েছে মিনাকুমারী আর অভিমন্যু। ভাবপ্রবণ অভিমন্যু কত সময় তার মনের ব্যথা ঢেলে উজাড় করে দিয়েছে চিঠির কাগজের উপর। দেখাও হয়েছে তার মিনাকুমারীর সঙ্গে দিন কয়েক। অনাথালয়ে যাওয়ার পথে রুকণীই বোধ হয় ইচ্ছে করে ঘটিয়ে দিয়ে থাকবে। মিল থেকে বলীরামপুর বাজারের অনাথালয় আড়াই মাইল দূর হবে। পথের দু'ধারে ঝোপ-ঝাড় জঙ্গল আমবাগান। বাজারের কাছাকাছি গিয়ে ঘন বসতি আরম্ভ হয়েছে।

এই পথের ধারের দীক্ষিৎদের আম-বাগানে দেখা হয়েছিল তাদের মিনাকুমারীর কাছ থেকে চিঠিখানা পাওয়ার পর।

মিনাকুমারী বড় সাবধানী বেশী। স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলেও গভীর আবর্তের দিকে যাতে সে না চলে যায়, সেদিকে তার সজাগ দৃষ্টি আছে। তাই সে সাধারণতঃ রহমতের বিবিকে মুখে মুখেই খবর পাঠাতো দরকার হলে। মিনাকুমারীর অভিমন্যুকে দেওয়া চিঠি, এই খানাই প্রথম, আর বোধ হয় এই শেষ। তাই এই চিঠিখানিকে যখের ধনের মত আগলে ঝোলার মধ্যে রেখেছিল অভিমন্যু।

সেদিন দেখা হয়েছিল তাদের, অনেক দিনের পর। যত দিন অভিমন্যুর সঙ্গে প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত দেখা হত অনাথালয়ে তত দিন মিনাকুমারী বেশী ভাববার সময় পায়নি; দুর্নিবার স্রোতে গা এলিয়ে দিয়েছিল। তার পর এত দিনের অদর্শনের ছুটিতে, তার হিসাবী-মন সমস্ত ব্যাপারটা সুস্থির হয়ে ভাববার সময় পায়। মনের তুলাদণ্ডে সে ওজন করে দেখতে চেষ্টা করে, জীবনের সাথীরূপে অভিমন্যুকে নেওয়ার লাভ-লোকসান। অভিমন্যুর বাড়ীতে আর কে আছে, বাড়ীর অবস্থা কেমন, জমি-জমা আছে কি না, কত কথা তার জানতে ইচ্ছা করে। মিনাকুমারী বোঝে মনে মনে যে, টাকা আনা পাইয়ের হিসাব খতিয়ে জীবনের সাথী বাছবার কথা শুনলে অভিমন্যু হাসবে। সে জানে দু'দিনের ভালবাসার বেলা এ প্রশ্ন অবান্তর হতে পারে, কিন্তু সারা জীবনের সঙ্গী যাকে করতে হবে, তার সম্বন্ধে এ সব খোঁজ নেওয়া অনুচিত নয়। চোখ বুজে সে অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে না।···ইউনিয়নের কাজ থেকে নিশ্চয়ই কিছু রোজগার আছে অভিমন্যুর। না থাকলে খাওয়া-পরা চলে কি করে? একেবারে বিনা মাইনেতে লোকে সারা জীবন কাজ করতে পারে এ কথা মিনাকুমারী ভাবতে পারে না।···

যে নির্ঝঞ্ঝাট শান্তিময় জীবন সে চায়, তা অভিমন্যুকে পেলে পূর্ণ হবে তো? অভিমন্যু যদি রাজনীতির কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন চাকরি-বাকরি বা রোজগার করে তাহ'লে বড় ভাল হয়। থানাপুলিশ, জেল,

অভাব-অনটন, অনিশ্চয়তা, নিত্য নূতন ঝঞ্ঝাট রাজনীতিক কর্মীর জীবনে মিনাকুমারীর জন্য, আর গার্হস্থ্য জীবনের লোভে অভিমন্যু কি কো দিন ছাড়তে পারবে এই জীবন? রুকণীর কাছেও সে ঘুরিয়ে ফিরি এই কথা জিজ্ঞাসা করে। রুকণীরও তাই মত।—সব খবর ভাল ভা না জেনে ফাঁদে পা দেওয়া ঠিক নয়। তুই বড়লোক স্বামী চাস না অতি সামান্য তোর প্রার্থনা। তাও যদি না পাস অভিমন্যুর কাছ থে তা'হলে খবদ্দার, ও-পথ মাড়াস না। না হলে সারা জীবন কেঁদে মরবি তার চাইতে এখানকার জীবন অনেক ভাল। সুখ না থাকুক আরা তো আছে। আবার ভাবিস না যেন যে তুই চলে গেলে আমাকে এক থাকতে হবে বলে আমি ভাঙচি দিচ্চি! আমি হিংসায়ও ফেটে পড়ছি বুঝলি! ঐ কুলী-মজুরদের সর্দারদের উপর আমার লোভ নে তোর মত।...

তার পরই মিনাকুমারী লিখেছিল ঐ চিঠিখানা অভিমন্যুকে। ম মনে ভেবেছিল, অভিমন্যুর জীবনের সব দরকারী খবর আজ কো রকমে জেনে নিতেই হবে। এর জন্য বেশী চেষ্টা করতে হয়নি। এ দিনের মনের রুদ্ধ স্রোত ছাড়া পাওয়ার আবেগে অনর্গল কথা বলে যা অভিমন্যু।......বাড়ীতে কেই বা আছে তার। থাকার মধ্যে আছে তো কাকা আর কাকীমা। তবে বুঝলে মিনা, সেদিকে যাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আমার জরিমানার টাকা সেবার কাকা দিয়েছিলেন তার পর কাকা-কাকীমার দিন-রাত আমাকে গালাগালি। আমি ব যে, আমি ক'দিন বাড়ীতে থাকি? আমার জমির ফসল তো কখনও থে আসি না। তা এত রাগারাগির দরকার কি, ও জমি ক'বিঘা তোমা নামেই লিখে দিচ্ছি ঐ জরিমানার টাকাটার বদলে। আমাদের বা দেখতে যাবে বলছ? সে গুড়ে বালি। গেলেই কাকীমা ঝাঁটা নি তাড়া করে আসবে। ওদেরই বা দোষ দিই কি করে। একবার যখ

ফেরার ছিলাম, তখন পুলিসে কাকার গরুর গাড়ী নীলাম করবে বলে নিয়ে গিয়েছিল কাছারিতে। এখন তাঁদের ইচ্ছে যে আমি গ্রামে বসে হাতুড়ে বদ্যির কাজ করি, বংশলোচন আর সোনাই-পাতা বেচি আমার বাবা-কাকার মত। তবেই আমাদের বংশের নাম অক্ষুণ্ণ থাকবে।

আরও সব এলোমেলো কথা এক জায়গায় করে মিনাকুমারী ধরে নেয় যে অভিমন্যু যে ভবিষ্যৎ জীবনের রূপরেখা এঁকেছে মনে মনে, তাতে রাজনৈতিক কর্মজীবন ছাড়বার কোন কথাই তার মনে ওঠেনি। তা হলে কি মিনারকুমারীকেও তার কর্মজীবনের সঙ্গিনী হতে হবে? রাজনৈতিক জীবনের কুশ্রী কর্মব্যস্ততা আর অনিশ্চয়তা তার সত্যি খারাপ লাগে। যদি তাকে অভিমন্যু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কাজ করতে নাও বলে, তা হলেও সংসারের খরচ চালাবার জন্য তাকে চাকরি করতেই হবে। এ মিলের চাকরি কিন্তু থাকবে না। করতে হবে অন্য চাকরি। সে কাজ আবার কেমন হবে তা কে জানে! মিনাকুমারী হিসাব করে দেখে। এর বদলে সে পাবে অভিমন্যুকে। সে লাভটা অনেকখানি। তার লোভ কম নয়। তবুও খানিকটা দোল খাওয়ার পর মনের দাঁড়িপাল্লায় লোকসানের দিক্‌টা ঝুঁকে পড়ে নীচে। ঘরপোড়া গরু সে। অনিশ্চিত জীবনের ঝক্কি পোহাতে সে রাজী নয়।

অথচ সত্যি ভাল লাগে তার অভিমন্যুকে। এ ভাল লাগার মধ্যে ভেজাল নেই। তাই তার মনের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠলেও, আজকের মনের ভাব সে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে দেবে না অভিমন্যুকে।

খানিক আগের দাঁড়িপাল্লার হিসাবটা ছিল পাইকারী, সারা জীবনের পণ্যের। খুচরো হিসাবের দাঁড়িপাল্লা আলাদা। এ হিসাবের অভিমন্যু তার ভালবাসার অভিমন্যু, সেই অনাথালয়ের 'কেসরপাক'-এর অভিমন্যু। এত দিনের অদর্শনের পর দেখা মানে একেবারে নতুন করে পাওয়া। সেই অভিমন্যুর কথা মনে করে সে হিসাব খতিয়ে বেহিসাবী হতে

পারে ;— সারা জীবনের জন্য নয়, খুচরো এক দিনের জন্য। কেবল আজকের দিনটার জন্য।

সারা জগৎ আজ বেহিসাবী হয়ে উঠেছে। দীক্ষিতদের আমবাগানে আমের মুকুলের হিসাব নেই, মৌমাছির গুঞ্জনের বিরাম নেই, পশ্চিমে বাতাসে পাতা-ঝরার শেষ নেই। আজকের দিনে মিনাকুমারী নিজের ভাণ্ডার উজাড় করে বিলিয়ে দিতে কার্পণ্য করবে না। কিন্তু কেবল আজকের দিনটার জন্য, আঁধারের কাছ থেকে চুরি করা এই সময়টুকুর জন্য।

এক ঝাঁক ফড়িংএর মত ছোট-ছোট পোকা ফড়-ফড় করে উড়ে তাদের জ্বালাতন করে মারলো। সত্যিকার বেহিসেবী অভিমন্যুর উষ্ণ নিশ্বাস লাগছে হিসেব-করা বেহিসেবী মিনাকুমারীর সঁীথির চুলে। আমের মুকুল থেকে দু'জনের দেহে টপ-টপ করে মধু-ঝরার বিরাম নেই। দু'টি দেহের দুয়ারে রসের ফোঁটার টোকা পড়ছে, কিসের যেন সঙ্কেত ক'রে। মধুতে চটচটে হয়ে উঠেছে ঝরাপাতার রাশি। মিনাকুমারীর আর অভিমন্যুর গায়ে, কাপড়ে, সর্বাঙ্গে যেখানে লাগছে এঁটে যাচ্ছে।...

মিনা,

তুমি কি আমার সঙ্গে দেখা করবে না এক দিনও? তুমি এমন কেন? সব কাজের মধ্যেও চব্বিশ ঘণ্টাই তোমার কথা মনে হয়। লক্ষ্মীটি, আমার মনের অবস্থা বুঝে দেরী কর না।

তোমারই

অভিমন্যু

১৩-৬-৪৭

মিনাকুমারী আর অভিমন্যুর জীবনের মামলায়, চিত্রগুপ্তের হাতের সব চেয়ে মারাত্মক দস্তাবেজ এইখান। এক অদ্ভুত কলহোন্মুখ পরিবেশের ভিতর হঠাৎ নাটকীয় ভাবে চিঠিখান বের করে দিয়েছিল এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার জয়নারায়ণ প্রসাদ, ট্রাউজারের পকেট থেকে।

গত কয়েক মাসে ইউনিয়নের শক্তি বাড়ায় মজুরদের বুকের পাটা বেড়েছে, আর শিউচন্দ্রিকার কাজের সুবিধা হয়েছে। কেসরপাকের পাট শেষ হওয়ার পর আর অনাথালয়ের সঙ্গে কোন বাধ্য-বাধকতার সম্বন্ধ নেই। হাকিম-হুকমদের ডাকবাংলায় থাকা নিয়ে আর রেখে-ঢেকে কথা বলে না শিউচন্দ্রিকা।

কলেক্টর সাহেব এসেছিলেন এক দিন ম্যাকনীলের কুঠিতে টেনিস খেলতে। মজুররা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে যে আজ নিশ্চয়ই ম্যানেজার সাহেব দালাল ইউনিয়নটা কায়েম করবার সম্বন্ধে কথাবার্তা বলবে।

মিল-গেট থেকে বেরুনোর সময় কলেক্টর সাহেবের গাড়ী ঘিরে ফেলেছিল মজুরের দল। বলেছিল একটু বেশী রাত্রি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে এখানে;—দেখবেন হুজুর কত রাত পর্যন্ত মেয়েরা কাজ করে এই মিলে

আপনার সম্মুখে সব অস্বীকার করে দেয়; আজ অন্য তিনটে গেট বন্ধ করে দিয়ে এই গেটে যদি দাঁড়ান, হুজুর, তাহ'লে নিজের চোখে হুজুর দেখে যেতে পারবেন। আর দেখুন মিলের 'গ্রেন-শপ'-এর চালের নমুনা। চাল বেশী কি কাঁকর বেশী আপনিই বলুন হুজুর। এ সস্তা চাল নিয়ে লাভ কি ?

"তা তোমরা দুপুরের খাওয়াটা মিলের ক্যান্টিনে খেলেই পার।"

সে আর বলবেন না হুজুর। সরকারী গুদামের পচা আটা বাংলা সরকার 'গরুর খাবার যোগ্য' বলে গত বছর নিলাম করেছিল। তাই এরা ক'হাজার বস্তা নিয়ে এসেছিল নৌকায় করে, গঙ্গা দিয়ে। সকালে সেই আটার কচুরি, আর দুপুরে সেই আটার রুটি দেয় হুজুর ক্যান্টিনে। একেবারে তেতো বিষ; খেলে পেট খারাপ হয়। হুজুর, একবার সস্তা 'গ্রেনশপ'-এ এই আটাটাও দেখে নেবেন। এখনই না দেখলে হুজুর দেখা আর না-দেখা সমান!

"না, না, এখন আমার একটু কাজ আছে ডাক-বাংলোতে। আমি কথা দিচ্ছি, কাল সকালে নিশ্চয়ই দেখব।"

হলও তাই। পরদিন সকালে কলেক্টর সাহেব এসেছিলেন 'গ্রেন-শপ'এ। অভিমন্যু আর মজুররা সেখানে অপেক্ষা করছিল তাঁর জন্য। কলেক্টর সাহেব মোটর গাড়ীতে বসে বসেই অভিমন্যুর সঙ্গে গল্প আরম্ভ করেন।

অভিমন্যু হাসতে হাসতে তাঁকে 'গ্রেন-শপ'এর আটাটার অদ্ভুত রং আর তার ভিতরের শান্তিপ্রিয় কীটগুলোর বিবরণ শোনায়।—আর সার, বাংলা দেশ থেকে যত হাজার বস্তা এসেছিল তার অর্দ্ধেক গিয়েছে ষ্টেশনের কাছের চনচনিয়া ফ্লাওয়ার মিলে। সেখানকার মজুরদের, সার, ভারি সুবিধা হয়েছে। ভাল আটার সঙ্গে কতটা পর্যন্ত এই আটা মিশোলে খেতে তেতো লাগে না, আর খেলে পেটের অসুখ করে না তারই

পরীক্ষা করবার জন্য, রোজ বিনা পয়সায় কচুরি খেতে পাচ্ছে সেখানকার মজুররা। এখানকার 'গ্রেন-শপ'এর আটার বস্তাগুলোর উপর, সার, দেখবেন এখনও সি, এফ, অর্থাৎ Cattle Fodder ছাপ মারা আছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবও অভিমন্যুর বলার ভঙ্গীতে না হেসে পারেন না। 'গ্রেন-শপ'এ কিন্তু এক বস্তাও সে আটা পাওয়া যায় না। জয়নারায়ণ প্রসাদ বলে—দেখলেন তো সার, ইউনিয়নের লোকদের সত্যি কথার একটা নমুনা।

"সব সরিয়ে ফেলেছে ; কাল রাতে এলে ধরতে পারতেন, সার।" অপ্রস্তুত অভিমন্যু কথার খেই হারিয়ে ফেলছে। তার দিকে একটা কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কলেক্টর সাহেব গাড়ীতে গিয়ে বসেন।

"ইউনিয়নের কর্মীর মিল-কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ আরও দায়িত্বশীল হওয়া উচিত।"

গাড়ী ষ্টার্ট দেয়।

যত দিন মজুররা ভাল ভাবে সংগঠিত হতে পারেনি, তত দিন মিল-কর্তৃপক্ষ ইউনিয়নটাকে নিয়ে বেশী মাথা ঘামাতেন না। মিটিংএ একটা-দু'টো জোর গলায় বক্তৃতা দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিতে চায় শিউচন্দ্রিকা তো করুক, তাতে কোম্পানির কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নেই।

সে ভাব আর রাখা চলে না। জয়নারায়ণ প্রসাদ ম্যাকনীল সাহেবকে বুঝোয় ঃ—আস্কারা পেয়ে পেয়ে মাথায় চড়ে গিয়েছে শিউচন্দ্রিকা, আর ঐ স্কাউণ্ড্রেল অভিমন্যুটা। দিন রাত মজুরদের উস্‌কানি দিচ্ছে। এ কি ছেলেখেলা পেয়েছে? মজুরদের সহজদাহ্য মন বেশ তেতে উঠেছে এরই মধ্যে, তার লক্ষণ কি দেখতে পাচ্ছেন না সার? আর ইউনিয়নের সম্বন্ধে উদাসীন থাকা চলে না। এখনও পিষে ফেলা যেতে পারে, পরে আর পারবেন না, সার।···

ম্যাকনীল সাহেবকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায় জয়নারায়ণ প্রসাদ।

এইবার ইউনিয়নের সঙ্গে খোলাখুলি সংঘর্ষে এগিয়ে আসে ম্যানেজার আর এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার !

খবর চাপা থাকে না। ম্যানেজারের অফিসে কি হচ্ছে না হচ্ছে, তার অধিকাংশ জিনিষের গন্ধ পায় মজুররা। দু'পক্ষই সচেতন হয়ে ওঠে। সুবিধা পেলে কেউ কাউকে ছাড়বে না।

মজুরদের দশ দফা দাবির ফিরিস্তি ম্যাকনীল সাহেব পান। সাহু-ব্যারাকের মাঠে শিউচন্দ্রিকার সভাপতিত্বে যে মিটিং হয়, তার প্রস্তাবগুলো বেরোয় পার্টির কাগজে।—এই মিটিং বলীরামপুর জুট মিলের মজুরদের ন্যূনতম মজুরি সপ্তাহে আরও দুই টাকা তিন আনা করিয়া বাড়াইবার দাবী করিতেছে।...ক্যান্টিনের অব্যবস্থার ঘোর নিন্দা করিতেছে।...ক্যান্টিনের তৈয়ারী করা ঝুড়ি-ভরা জলখাবার ৩০।৫।৪৭ তারিখে সন্ধ্যার সময় রিকশায় করিয়া অনাথালয়ে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল কি না, সে সম্বন্ধে তদন্ত করিতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে অনুরোধ করিতেছে।...মিলের 'ক্রেশে'র নাম করিয়া যে দুধ আসে তাহার সমস্তটাই উর্দ্ধতন কর্মচারীদের কুঠিতে চলিয়া যায়, এবং ক্রেশে'র অল্পবয়স্ক শিশুদের কেবল ভাতের মাড় খাওয়ানো হয় কি না, এ বিষয়ে পাবলিকের সম্মুখে তদন্ত করা হউক।...সরকারী কর্মচারীরা বলীরামপুরে আসিয়া কোথায় ভোজন করেন, এবং টুরে আসিয়া কে কি কাজ করেন তাহার তদন্ত করিতে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হইতেছে।...

এ ছাড়া আরও অনেক খুচরা দাবির প্রস্তাব বিশদভাবে পার্টির কাগজে দিয়াছে। সবই ম্যানেজার সাহেবের নজরে পড়ে।

অভিমন্যু প্রত্যহ ছুটির সময় মিল-গেটে বক্তৃতা করে, আর সন্ধ্যার পর সাহু-ব্যারাকে ভজনের দলে গান গায়।

ইউনিয়নের অফিসঘরের বাড়ীওয়ালা হঠাৎ বাড়ী ছেড়ে দেওয়ার

জন্য নোটিশ দেয়, সে নিজেই না কি ঐ বাড়ীতে থাকবে। এক নম্বর গেটের পাশের এত কালের তালা দেওয়া গুদামটার উপর এক দিন হঠাৎ একটা নিশান ওড়ে। রামভরোসা সর্দারের নতুন ইউনিয়ন খুলেছে সেখানে। সিরিয়া নামের একটি অল্পবয়সী নতুন মজুরণী সাহু-ব্যারাকে এক দিন রাত দুপুরে চেঁচিয়ে উঠে হৈ-চৈ বাধিয়ে দেয়। এরই জন্য কালু সর্দারকে পুলিশ গ্রেফতার করে সদরে নিয়ে যায়। এস, ডি, ও, সাহেব তার জামিনের দরখাস্ত অগ্রাহ্য করেন।

মিলের প্রায় অর্দ্ধেক মজুর থাকে মিলের ব্যারাকে। আর বাকী সকলে থাকে বাইরের লোকদের অন্য সব ব্যারাকে, ঘর ভাড়া নিয়ে। মিলের ব্যারাকের সাপ্তাহিক ভাড়া আদায় করে দু'জন ষণ্ডা ভোজপুরী দারোয়ান। তারা হঠাৎ এক দিন ইউনিয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি মজুরের ঘরে তালা দিয়ে দেয়; তারা না কি সময় মত ভাড়া দেয় না

শিউচন্দ্রিকার কাছে ছাপরার উকীলের নোটিস আসে—ঘিণাওন সিংএর বিধবা স্ত্রী তাহার স্বামীর মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যে টাকা পাইয়াছিল, তাহা শিউচন্দ্রিকাবাবুর নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিল। সে টাকার হিসাব এক মাসের মধ্যে যেন শিউচন্দ্রিকাবাবু দিয়া দেন। নচেৎ তাঁহাকে বাধ্য হইয়া আইনের অপ্রিয় পথ লইতে হইবে।

রহমৎ বলে, এ সব করাচ্ছে সরযূ সিং, অভিমন্যুর পেয়ারের দোস্ত। রামভরোসা সর্দার, আর জয়নারায়ণ প্রসাদের সঙ্গে ওটাকে গুজগুজ করতে দেখেছি। মনিঅর্ডারের রসিদগুলো তার কাছ থেকে ফিরিয়ে নিতে অভিমন্যু ভুলে গিয়েছিল।

শত্রু-শিবির একেবারে তছনছ করে দিতে চায় জয়নারায়ণ প্রসাদ। আক্রমণই আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ কৌশল তা সে জানে।

অপর পক্ষও বসে থাকে না চুপটি করে। লুম-ডিপার্টমেণ্টেই ইউনিয়নের প্রভাব সব চেয়ে বেশী। এই তাঁত-ঘরের মজুররা কালু সর্দারের গ্রেফ্তারের প্রতিবাদে এক দিন কাজ ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

মিল আর রেল-লাইনের মধ্যে যে জলা জমিটা আছে সেখানে চরতে গিয়েছিল ধনিরাম ব্যারাকের মালিকের মোষ দু'টো। যেদিন কলেক্টর সাহেব এসেছিলেন, সেদিন ঐখানেই রাতারাতি ফেলা হয়েছিল বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের 'পশুর খাদ্য' ছাপ দেওয়া আটার বস্তাগুলো। তার পরের দিনই ধনিরামের মোষ দু'টো—চরতে গিয়ে ঐ 'পশুর খাদ্য' আটা খায়। তার দু'দিনের মধ্যে রক্ত-আমাশার মত একটা ব্যায়রামে দু'টোই মরে যায়। ধনিরাম সেই কথা বলতে আসে শিউচন্দ্রিকাকে। তাকে দিয়ে শিউচন্দ্রিকা মিলের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আনায়। সে জানে যে, এ মোকদ্দমা চলবে না; কিন্তু কাগজ-কলমে একটা প্রমাণ থেকে যাবে, ম্যাকনীল সাহেব আর জয়নারায়ণ প্রসাদের বিরুদ্ধে; কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে তাদের গিয়ে; ধনিরাম খরচ করে ভাল উকিল রাখবে তাদের জেরা করবার জন্য।......

মজুরদের উপর জুলুমের প্রতিবাদের জন্য টেলিগ্রামের উপর টেলিগ্রাম যায় পাটনায়। ধর্মঘটের চরম-পত্রের নকল যায় লেবার কমিশনর সাহেবের কাছে। শিউচন্দ্রিকা নিজে পাটনা যায় মজুর বিভাগের মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর অনেক কাজ; এই সব ছোট-খাটো ব্যাপার নিয়ে মাথা-ঘামানোর সময় নেই। তবে তিনি শিউচন্দ্রিকার দরখাস্ত পাঠিয়ে দেন লেবার কমিশনারের কাছে আর তাঁকে লিখে দেন, যত শীঘ্র সম্ভব বলীরামপুর যেতে।

লেবার কমিশনার সাহেব দুই পক্ষকেই ডাকেন ডাক-বাংলাতে।

শিউচন্দ্রিকা গেলে তাকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেন, সন্ধ্যার পর তিনি তার সঙ্গে কথা বলতে চান একান্তে, সরকারী কর্মচারীদের সম্বন্ধে। আর পনের মিনিট পর থেকে মজুরদের দাবির তদন্ত আরম্ভ হবে। বসুন ততক্ষণ আপনারা ঐ ঘরে।

ডাকবাংলায় একটা টেবিলের চার দিকে সবাই বসে। মধ্যেখানে লেবার কমিশার। তাঁর এক দিকে ম্যাকনীল সাহেব আর জয়নারায়ণ প্রসাদ; অন্য দিকে শিউচন্দ্রিকা আর অভিমন্যু। এক দিক্‌কার লোকেরা অন্য দিকের লোকদের দিকে তাকায় না। সকলেই যেন লেবার কমিশনারের সঙ্গে গল্প করবার জন্য উদ্‌গ্রীব। ম্যাকনীল সাহেবের মত কেতা-দুরস্ত লোকও আজ শিউচন্দ্রিকাকে অভিবাদন করে না। ম্যানেজার সাহেব মনে করে যে, আজ শিউচন্দ্রিকার প্রতি শিষ্টাচার দেখালে, যে কয় জন মজুরদের দিকের সাক্ষী বাইরে বসে রয়েছে তারা ভুল ভাববার সুযোগ পাবে যে, সাহেব শিউচন্দ্রিকার খোসামোদ করছে। আর শিউচন্দ্রিকারও ভয়-ভয় করে যে আজ জয়নারায়ণ প্রসাদকে সাধারণ সৌজন্য দেখালেও, মজুররা আবার তাকে শুদ্ধ 'দালাল' না বলে বসে।

মিছিল করে নানা রকম ধ্বনি দিতে দিতে কয়েক হাজার মজুর এসে ঢোকে ডাক-বাংলার হাতায়। লেবার কমিশনার সাহেব বিরক্ত হয়ে ওঠেন।

"এদের আবার কেন আনিয়েছেন শিউচন্দ্রিকা বাবু? এদের তো আসবার কথা ছিল না?"

"না সার, আমি আসতে বলিনি। আপনি এসেছেন শুনতে পেয়ে ওরা এসেছে আপনার কাছে। এ বিষয়ে ওরা আমার কথাও শুনবে না।

"তাহলে আবার আপনার মজুরদের উপর প্রভাব কি আছে?

লেবার কমিশনার সাহেব নিজে গিয়ে তাদের ফিরে যেতে বলেন।

"না হুজুর, আমরা একটুও গোলমাল করব না।"

কি আর করেন কমিশনার সাহেব। হয়ত এগুলো একটা গোলমাল বাধাবে বলেই এসেছে। বারণ করলেও শুনবে না। জোর জার করতে গেলে এখনই হৈ-চৈ বাধিয়ে দেবে একটা। আজকাল আর সম্মানের সঙ্গে চাকরি-বাকরি করবার উপায় নেই। "আচ্ছা তোমরা তাহ'লে বসে পড় যে যেখানে আছ। চেঁচামেচি করলে কিন্তু তোমাদের এখানে থাকতে দেব না।"

হঠাৎ ডি, এস, পি, আর এস, ডি, ও, সাহেব মোটরে এসে হাজির হয় ডাক-বাংলাতে।

"আপনাদের কে খবর দিল আসতে?" কে যে খবর দিয়েছে, তা আর কমিশনার সাহেবের বুঝতে বাকী নেই।

অভিমন্যু জবাব দেয়, "এখানে আসবার জন্য খবর পাবার দরকার হয় না ওঁদের। প্রায় রোজই আসেন ওঁরা এখানে।

তার দিকে অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি হানে জয়নারায়ণ প্রসাদ আর ডি, এস, পি।

শিউচন্দ্রিকা অভিমন্যুকে কোন কথা বলতে বারণ করে; হাওয়া এখন আমাদের দিকে। দু'টো সস্তা ঠাট্টা করে সেটাকে নষ্ট হতে দিও না। শিউচন্দ্রিকা মনে মনে বোঝে যে, আজ আবহাওয়া ভাল। লেবার কমিশনার মজুরদের উপর একটু প্রসন্ন আছেন কেন যেন। ইনি ন্যায় বিচার করবার চেষ্টা করবেন আজ! "আচ্ছা, এবার কাজের কথা আরম্ভ হোক।"—বাইরে মজুরদের গুঞ্জনধ্বনি থেমে যায়।

"—আমার 'থ্যাঙ্কলেস' কাজ, আপনাদের দুই পক্ষের সহযোগিতা বিনা অসম্ভব। আমি যত দূর বুঝেছি, বর্তমানে মজুর ও মিল-মালিক দুই পার্টিরই শান্তিপূর্ণ ভাবে আপোষ করবার মনোভাব নেই। কিন্তু

এই মনের ভাব কারও পক্ষেই ভাল নয়। সব দায়িত্বশীল লোকই বুঝবেন যে, দেশের পক্ষেও জিনিষটা ক্ষতিকর…”

কোন পক্ষই লম্বা লেক্‌চার শুনতে তৈরী নয়। কাজের কথা চায় তারা।

ম্যাকনীল সাহেবই প্রথম কথা বলে;—আমরা আপোষ করতে চাই মজুরদের সঙ্গে, তাদের তথাকথিত নেতাদের সঙ্গে নয়।

শিউচন্দ্রিকা বলে—আমরা তো সার সদ্ভাব চাই বলেই আপনাকে খবর দিয়েছি।

তার পর আরম্ভ হয় উভয় পক্ষের শুনানি। শুনানি মানে বাক্‌-বিতণ্ডা, কথা কাটাকাটি; কখনও নরম তর্ক, আবার কখনও বা হাতাহাতি হবার উপক্রম। জয়নারায়ণ প্রসাদ কথায় কথায় স্প্রিংয়ের মত লাফিয়ে ওঠে। হাত-পা নেড়ে মাথা নেই মুণ্ডু নেই কত কি বলে যায়। ম্যাকনীল সাহেবের সম্মুখে আরও বেশী করে সে নিজের কর্মনিষ্ঠা দেখাতে চায়।

শিউচন্দ্রিকা বাজে কথা বলে না একটিও। মজুররা ভাবে এত বহস্‌ করছে এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার, ওরই বুঝি জিত হবে। কিন্তু শিউচন্দ্রিকার প্রতিটি যুক্তি অকাট্য। কাগজ-পত্র, ফাইল, তারিখ, সব তার তৈরী। কলকাতার কোন জুট মিল কি মজুরি দেয় বিভিন্ন বিভাগে, সব তার মুখস্থ। কলকাতার প্রতিটি জিনিষের দাম, এখানকার সরকারী গেজেটের বাজার-দর, মুনাফার হার, আবশ্যক জিনিষের দরের প্রতি মাসের সূচক-সংখ্যা সব তার নখদর্পণে। বলীরামপুর জুট মিলের গত দশ বছরের লাভের এবং মজুরদের আয়ের পাশাপাশি ‘গ্রাফ’ এঁকে রেখেছে সে। কমিশনার কেন, ম্যাকনীল সাহেব পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে ওঠেন জয়নারায়ণ প্রসাদের উপর।—কাগজ-পত্র আঁক-জোখ, হিসাব, সংখ্যা, কিছু নিয়েই সে তৈরী নেই; নিশ্চিতভাবে শিউচন্দ্রিকার

একটা যুক্তিরও সে খণ্ডন করতে পারছে না; কেবল বাজে চেঁচামেচি করছে।

তবে এই মজুরির বিষয়ে ঝট করে কিছু করতে চান না লেবার-কমিশনার। মিলকর্তৃপক্ষও কাগজ-পত্র নিয়ে ভাল ভাবে তৈরী হলে মাস খানেক পরে এর বিচার করতে আবার আমি আসব। কলকাতার রেট আপনারাও আনাবেন মিষ্টার ম্যাকনীল। আর সব দরকারী হিসাব-পত্র···

"হিসাবের কোন্ খাতাটা হুজুর? ইনকাম-ট্যাক্সেরটা না আসলটা? মজুরদের হাজরি-বই পর্যন্ত দু'সেট আছে সার।"

অভিমন্যু আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল। শিউচন্দ্রিকা তাকে থামিয়ে দেয়। বাইরের মজুরদের গুঞ্জন-ধ্বনিতে বোঝা যায় যে, অভিমন্যুর কথাটা তাদের বেশ মনের মত হয়েছে।

"আচ্ছা, এই দুই নম্বরের আইটেম 'ক্যানটিন'এর সম্বন্ধে অভিযোগ, আর তিন নম্বরের আইটেম, 'ক্রেশে'র সম্বন্ধে অভিযোগে আসা যাক। দেখুন মিষ্টার ম্যাকনীল, মজুরদের সুখ-সুবিধা দেবার বিষয়গুলিতে আমি খুব গুরুত্ব দিই। এ সব বিষয়ে আপনাদের ইচ্ছাকৃত ত্রুটি দেখতে পেলে আমি আপনাদের ছাড়ব না।"···

শিউচন্দ্রিকা বোঝে যে, আসল মজুরি বাড়ানোর দাবিটা কমিশনার এখনকার মত চাপা দিয়ে দিলেন। এখন এই সব ছোট খাটো ব্যাপারগুলো নিয়ে নিজের পক্ষপাতহীনতা দেখাবেন।

"হুজুর রামপীরিত আহির সাক্ষী দেবে 'ক্রেশে'র দুধটা কার কার বাড়ী যায়; আর ক্যানটিনের ব্যাপারটায়···

কথাটা শেষ হবার আগেই লাফিয়ে ওঠে চেয়ার থেকে জয়নারায়ণ প্রসাদ।—"কাদের সঙ্গে কথা বলছেন হুজুর, কতকগুলো চরিত্রহীন ছোটলোকের দল, যারা মজুরদের নাম ভাঙ্গিয়ে নিজেদের পেট চালায়···"

হাঁ-হাঁ করে উঠে দাড়িয়েছে বাইরের লুম্-ডিপার্টমেণ্টের মজুররা; তার পর তাদের দেখাদেখি অন্য সব মজুররা। তাদের মন্ত্রীজীর সম্বন্ধে এই কথা বলতে সাহস করছে এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার, তাদেরই সম্মুখে! আশ্চর্য বুকের পাটা লোকটার! দু'-দু'টো অনাথালয়ের মেয়েকে এখনও ঢুকিয়ে রেখেছে মিলের মধ্যের কোয়ার্টারে; অনাথালয়ের মেয়ে পাঞ্জাবে বেচে, যার রোজগার মিলের রোজগারের চাইতে বেশী, সেই লোকটাই অভিমন্যু আর শিউচন্দ্রিকাকে লম্পট বলে! জুতিয়ে মুখ ভেঙ্গে দেব।

এগিয়ে আসে রহমৎ, তার বিবির চাকরির কথা ভুলে। এগিয়ে আসে ফিনিশিং ডিপার্টমেণ্টের বচ্‌কন সর্দার। বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় তারা জয়নারায়ণ প্রসাদের উপর।

ম্যাকনীল আর এস, ডি, ও সাহেব মজুরদের হাব-ভাব দেখে ভয় পেয়ে যান। লেবার কমিশনার শিউচন্দ্রিকার দিকে তাকিয়ে অনুযোগ করেন,—এই জন্য মজুরদের এখানে আসতে দিতে আমার আপত্তি ছিল—তা তো আপনারা শুনলেন না। এখন যে রকম দেখছি, কাজ স্থগিদ করে দিতে হবে।

শিউচন্দ্রিকা বলে—"অভিমন্যু গিয়েছে বাইরে! এক মিনিটের মধ্যে মজুররা ঠাণ্ডা হয়ে নিজের নিজের জায়গায় বসবে।"

হলও তাই। অভিমন্যু ফিরে এসে বসল নিজেয় চেয়ারে। ডি, এস, পি, আর্দালীর মারফৎ কি যেন একখানা চিঠি পাঠালেন থানার দারোগার কাছে।

চারিদিক্ নিস্তব্ধ হলেও ঘরের সকলেই বোঝে যে, জয়নারায়ণ প্রসাদের আর একটি অসাবধান কথার ফুলকি, দপ করে আগুন লাগিয়ে দিতে পারে এই বারুদের স্তূপে। তখন আর হাজারটা অভিমন্যু এলেও তাদের থামাতে পারবে না।

চতুর্দিকের এই থমথমে ভাবটা কিন্তু একটুও দমাতে পারে না

জয়নারায়ণ প্রসাদকে। এই অগাধ আত্মপ্রত্যয়ই তার জীবনের সাফল্যের মূলে।

"উভয় পক্ষের সম্বন্ধ যথেষ্ট তেতো হয়েছে। অযথা তা আর বাড়িয়ে লাভ কি ?" লেবার কমিশনার জয়নারায়ণ প্রসাদকে আর একটু বুঝে-শুঝে কথা বলতে বলেন ইউনিয়নের কর্মীদের সম্বন্ধে।

"প্রত্যেকটি কথা আমি আগে ওজন করে নিয়ে তবে বলেছি। সত্যি কথা বলতে আমি ভয় পাই না। আপনি সার- এই ইউনিয়নের গুণ্ডাদের চেনেন না।"

অবাক হয়ে যায় শিউচন্দ্রিকা। এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজারকে সে ভাল ভাবেই জানে। তার মত কূটবুদ্ধি লোক হঠাৎ গায়ে পড়ে এত গালাগালি দিতে আরম্ভ করল কেন তাদের ? আর কিছু কি বলবার নেই মিল-মালিকের পক্ষ থেকে ? দিক, প্রাণ ভরে গালাগালি দিক জয়নারায়ণ। গালাগালির জবাবে শিউচন্দ্রিকা দেবে নথি প্রমাণ, কাগজ। মাথা গরম করলে, ইউনিয়নের দাবি পূরণের দিক থেকে কিছু সুবিধা হবে না : আর সব চেয়ে বড় কথা যে লেবার কমিশনার এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজারের এই অসংযত কথাবার্তা পছন্দ করছেন না। জয়নারায়ণের কথা যেন একটাও তার কানে যায়নি, এমনি ভাব দেখিয়ে, শিউচন্দ্রিকা ফাইল থেকে বার করে ধনিরামের মোষ মরার মোকদ্দমার কাগজপত্র।

অভিমন্যু চীৎকার করে ওঠে হঠাৎ ;—মুখ সা[illegible] কথা বলবেন জয়নারায়ণ বাবু। কমিশনার সাহেব, আপনিই জিজ্ঞাসা করুন জয়নারায়ণ বাবুকে, ডাক-বাংলার এই ঘরখানাকে কেন এক দিন পাড়ার লোকে অর্দ্ধেক রাত্রে ঘিরে ফেলেছিল।

এস, ডি, ও, সাহেবের মুখ শুকিয়ে যায় ভয়ে। লেবার কমিশনারের মুখে একটু যেন কৌতূহল প্রকাশ পায়। বাইরের মজুরদের মৃদু স্বরে

রুক্ষতার আভাস পাওয়া যায়। তারা অভিমন্যুর তারিফ করছে,—বলবার মত যা কিছু বলছে তো অভিমন্যুই; মন্ত্রীজীর আজকে কি যেন হয়েছে; কাগজের লেখা তো হাকিম যখন ইচ্ছে পড়ে নিতে পারবে; কিন্তু তার সম্মুখে জবাব দেবার সুবিধা তো আর পরে পাবে না।···

"ডাক-বাংলাতে কবে কি হয়েছিল না হয়েছিল, আজকের তদন্তের সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ তা' আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না। কেবল অনর্থক আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করবার নতুন নতুন রাস্তা বার করছে এরা।" এতক্ষণে এই প্রথম কথা বলল ম্যাকনীল সাহেব।

"দু'টোর সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বলেই বলছি, না হলে বলতাম না।" রুক্ষ স্বরে জবাব দেয় অভিমন্যু।

বাইরে মজুরদের কথাবার্তাও বেশ তীব্র ঝাঁজালো হয়ে এসেছে। আর বোধ হয় তাদের সংযত করে রাখা যাবে না।···

"এই দেখুন সার এই ত্যাগী সন্ন্যাসীদের নৈতিক চরিত্রের একখানা প্রমাণ-পত্র।"—নাটকীয় ভাবে ট্রাউজারের পকেট থেকে বার করে, একটি-একটি করে ভাঁজ খুলে জয়নারায়ণ প্রসাদ চিঠিখানি দেয় লেবার কমিশনারের হাতে। তার মুখে বিজয়ীর দীপ্তি, প্রতি অঙ্গভঙ্গীতে সাফল্যের ব্যঞ্জনা। মরা বাঘের দেহটার উপর এক পা তুলে দিয়ে বন্দুককধারী শিকারী ফটো তোলাতে দাঁড়ালে ঠিক এমনি দেখায়।

লেবার কমিশনার চিঠিখানা পড়েন। "ব্যাপারটা কি পরিষ্কার করে বলুন তবে তো বুঝি।"

শিউচন্দ্রিকা আর অভিমন্যু ঝুঁকে পড়ে কাগজখানা দেখবার জন্য; কমিশনার সাহেব চিঠিটা দেন শিউচন্দ্রিকাকে। উদগ্র কৌতূহলে দশ হাজার মজুরের কান খাড়া হয়ে ওঠে।

অভিমন্যুর ক্রোধের আগুন দপ করে নিবে যায়। মুখখানা ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে। ধরা পড়ে গিয়েছে সে হাতে-নাতে।

রহমতের বিবির মারফৎ পাঠানো এই চিঠিখান কি করে এল জয়নারায়ণ প্রসাদের হাতে? মিনাকুমারীর বাক্স থেকে নিশ্চয়ই কোন রকমে চুরি করিয়েছে জয়নারায়ণ। চিঠিখানা সযত্নে বোধ হয় তুলে রেখেছিল মিনাকুমারী বিছানার নীচে। চিঠিখানা পড়ে তখনই যদি ছিঁড়ে ফেলে দেয় মিনাকুমারী, তা'হলে আর এ' বিপদে পড়তে হয় না। ছেঁড়া বললেই কি ছেঁড়া যায় এ সব চিঠি। অভিমন্যু নিজেও তো জানে! কত বার হয়ত পড়েছে মিনাকুমারী এই চিঠিখান—কত রাত পর্যন্ত।...

বর্তমান আবেষ্টনীতে এ চিঠির গুরুত্ব সে যথেষ্ট বোঝে। এতগুলো মজুরের চোখে সে মুহূর্তের মধ্যে এস, ডি, ও, সাহেবের চাইতেও হেয় হয়ে যাবে। আর সব চাইতে বড় কথা যে, শিউচন্দ্রিকার কাছে সে অবিশ্বাসী হয়ে যাচ্ছে। এর পর জয়নারায়ণকে হয়ত বা শিউচন্দ্রিকা বিশ্বাস করতে পারে, কিন্তু তাকে কোন দিনই পারবে না। আর সময় নেই ভাববার। কোণঠাসা জানোয়ারের মত সে মরিয়া হয়ে ওঠে।...সে নিজের কথাই ভাবছে এতক্ষণ। আর মিনাকুমারীর দিক্‌টা সে ভাবছেই না; অনুশোচনায় তার মন ভরে উঠে। তার নামেও কলঙ্ক লাগিয়েছে সে।...ইউনিয়নের স্বার্থে আঘাত লাগবে বলে অভিমন্যু তার জীবনের স্বপ্ন সাধ মুছে ফেলে দিতে পারে না। কারও মুখ চেয়ে সে কথা বলবে না। সে-সর্বসমক্ষে পরিষ্কার ভাবে তার প্রাণের কথা বলবে। বলবে যে, সে চায় মিনাকুমারীকে, আর মিনাকুমারী চায় তাকে। তারা চায় বাসা বাঁধতে; এর মধ্যে অসম্মানজনক কিছুই নেই, কারও কাছে লুকোবার কিছু নেই।

শিউচন্দ্রিকাও অবাক হয়ে গিয়েছে চিঠিখানা দেখে। জাল নয় তো? হাতের লেখা অভিমন্যুর মতই মনে হচ্ছে! অভিমন্যু! অভিমন্যুর মুখের দিকে তাকিয়েই সে সমস্ত ব্যাপারটার একটা ধারণা করে নেয়। শিউচন্দ্রিকা স্থিতধী লোক। অভিমন্যুর উপর চটবার সে অনেক সময়

পাবে পরে। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই চিঠিখানি প্রকাশ হয়ে যাবার ফলাফল—মজুরদের দাবির উপর, লেবার কমিশনারের মনের উপর, ইউনিয়নের সংগঠনের উপর, আর তার পার্টির সুনামের উপর কি হবে, সেইটাই সে মনে মনে হিসাব করছে। সেই বুঝেই এখানকার ব্যবস্থা করতে হবে তাকে এখনই। অভিমন্যুর কথা কানে আসে,—"হাঁ সার, এ চিঠি আমারই লেখা।"

জয়নারায়ণ প্রসাদ তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে,—"তবু ভাল যে আপনারা চিঠিখানাকে জাল বলেননি।"

তারপর কমিশনার সাহেবকে আদ্যন্ত ঘটনাটা শোনায়—"মিনাকুমারী মিলের ক্যানটিনে মেয়েদের বিভাগের সুপারভাইজর। তাঁর কোয়ার্টার মিলের ভিতর। তাঁর কাছে এই মহাত্মাটি এই অভদ্র চিঠিখান পাঠিয়েছিলেন। ভদ্র-মহিলা তো এই চিঠি পেয়ে রাগে অপমানে কেঁদে-কেটে আকুল। তার পর তিনি এই চিঠিখান ম্যানেজার সাহেবকে দেন এই অপমানের প্রতিকারের জন্য। বোঝেনই সার, এক জন অবিবাহিতা ভদ্র-মহিলার এই সব বিষয় নিয়ে কোর্টে যাওয়াও কতটা বিপজ্জনক। আমি খালি এই স্কাউণ্ড্রেলটার আসল রূপ আপনার কাছে ধরে দেওয়ার জন্য এই চিঠি সকলের সমক্ষে আনলাম। ক্যান্‌টিন আর ক্রেশের সুপারভাইজর দুইজনকেই এই ইউনিয়নের মহাত্মাদের তদ্বিরে আমরা বাহাল করি। সেই মহিলারা যে নিজেদের মর্যাদা সম্বন্ধে সজাগ হতে পারেন, এটা বোধ হয় এঁরা আশা করেননি। আমার শালীনতাবোধ এর চাইতে পরিষ্কার করে কথাটা আমাকে বলতে দিচ্ছে না। অল্প কথায়,—প্রেমে হতাশ না হলে ক্যান্‌টিন আর ক্রেশের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আসত না, এ আমি জোর-গলায় বলতে পারি।"

আসল ব্যাপারটা কিন্তু ঘটেছিল অন্য রকম। জয়নারায়ণ যখন আক্রমণের নীতি নেয়, তখন আট-ঘাট বেঁধেই কাজ করে। চোখ রাখে

সজাগ, কান রাখে খাড়া করে। সব রকম অস্ত্র শাণ দিয়ে ঝকঝকে করে রাখে, কখন কোনটার দরকার পড়বে কিছু বলা যায় না। জলের মত বইয়ে দেয় টাকা। উপরের সরকারী অফিসার থেকে আরম্ভ করে ইউনিয়নের নিম্নতম কর্মী পর্যন্ত সকলকে কিনে নেওয়ার চেষ্টা করে টাকা দিয়ে। যাদের লোভ দেখিয়ে হাত করতে পারে না, তাদের জন্য তৈরী হয় কড়া ওষুধ।

অভিমন্যু চিঠিখান দিয়েছিল ঠিকই রহমতের বিবির হাতে। টাকার খেলাতেই চিঠিখান মিনাকুমারীর হাতে না পড়ে, পড়ে রুকণীর হাতে। রুকণীই চিঠিখানা দেয় জয়নারায়ণকে। রুকণীর সঙ্গে জয়নারায়ণ প্রসাদের সম্বন্ধটা ঠিক আলাপ-পরিচয়ের পর্যায়ে পড়ে না। একটু হয়ত বাড়িয়ে বললেও অনাথালয়ের ডেঁপো ছেলেরা মোটামুটি ঠিকই বলত।

জয়নারায়ণ টাকা ঢালতে রাজী ছিল অভিমন্যুর চিঠির জন্য। অনাথালয়ে মানুষ হওয়া মেয়ের পক্ষে টাকার লোভ সামলানো শক্ত, এ কথা জয়নারায়ণ প্রসাদ বোঝে। তাই রুকণী যখন চিঠিখান নিয়ে গিয়ে তার হাতে দিল, তখন সে আশ্চর্য হয়নি।

কিন্তু একটা কথা রুকণী ছাড়া আর কেউ জানে না। এই চিঠির ব্যাপারে জয়নারায়ণের দেওয়া টাকার কথাটাই তার কাছে সব ছিল না। এ ছাড়া আরও কয়েকটি জিনিষ তার মনের মধ্যে কাজ করেছে। হয়ত একটা ঈর্ষার ছোঁয়াচ ছিল এর মধ্যে। সে মিনাকুমারীর থেকে সুন্দরী ; তার কথাবার্তার একটা আকর্ষণ আছে, সে কথাও সে জানে। তবু সে অভিমন্যুর মনে সাড়া জাগাতে পারেনি। মিনাকুমারীর কাছে এই প্রথম পরাজয়ের গ্লানিটা, সে বোধ হয় মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি একেবারে। মিনাকুমারীর সব মনের কথা সে শুনেছে ; কিন্তু নিজের মনের গোপন কোণের এই খবরটা সে মিনাকুমারীকে জানতে দেয়নি কোন দিন। কত কথা মনের কোণে উঁকি-ঝুকি মারে, সব কি বলা

ায় ? আর অভিমন্যুর কথা কি কখন বলা যায় মিনাকুমারীর কাছে ?...
মিনাকুমারী বিয়ে করে এখান থেকে চলে যায়, তাও রুকণী চায় না।
দু'জন একসঙ্গে থাকলে তবু লোকের মুখ কতকটা বন্ধ করা যায়।...
আজকালকার চাকরির জীবনও রুকণীর খারাপ লাগে না। বিয়ে করতে
তার আপত্তি নেই। তবে সে বিবাহিত জীবনে চায় স্বাচ্ছল্য আর সমৃদ্ধি ;
আর বিবাহের পরও সে চায় উছল জীবনের স্পন্দনের নিত্য-নূতন
উদ্দীপনা। বোধ হয়, অনাথালয়ের মেয়ের পক্ষে অমন বিবাহ সম্ভব নয় !
সেই জন্য সে জোর করে নিজের বিয়ের কথা ভাবতে ভুলেছে। তবু
মাঝে-মাঝে বার্দ্ধক্যের কথা মনে হলে ভয় হয়। এখনও রক্তের জোর
আছে, যখন সেটা থাকবে না, তখন কি হবে ? বিয়ে করতে হলে এখনই
করা ভাল, কত দিন এ কথা তাকে বুঝিয়েছে মিনাকুমারী।

এ সব সত্ত্বেও হয়ত রুকণী অমন সুশ্রী হাসিমুখ ছেলেটাকে বিপদে
ফেলবার জন্য এমন ষড়যন্ত্র করত না এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজারের সঙ্গে মিলে।
কিন্তু যখন তার কাজের সম্বন্ধে, তার 'ক্রেশে'র সম্বন্ধে অভিযোগ
অভিমন্যুরা কাগজে ছাপিয়ে বার করতে লাগল, তখন আর সে নিজের
মাথা ঠিক রাখতে পারল না। একজন তার অনিষ্ট করে যাবে, আর সে
নির্বিবাদে সয়ে যাবে, তেমন মেয়ে রুকণী নয়। একটা স্থির উদ্দেশ্য নিয়ে
সে উঠে-পড়ে লাগতে জানে ; আঘাত ফিরিয়ে দিতে জানে।

আর মিনাকুমারী এখনও জানতে পারেনি অভিমন্যুর এই চিঠিখানির
কথা। সেই দিনকার সন্ধ্যার স্মৃতির পরশ এখনও লেগে আছে তার
মনে ; খালি মনে কেন, সারা দেহে। অভিমন্যুকে সে ভালবাসে বলেই
তার মন নিয়ে সে ছিনিমিনি খেলতে চায় না আর। তাই সে অভিমন্যুর
কোন চিঠির জবাব দেয় না আজকাল। আর সে অভিমন্যুর ব্যথার
আগুন বাড়তে দেবে না নিজে ইচ্ছা করে। সে তো বেশী কিছু আশা
করেনি অভিমন্যুর কাছে। চেয়েছিল মাত্র একখান বেড়া দিয়ে ঘেরা

ছোট আঙ্গিনা। এই সামান্য আকাঙ্খাও পূর্ণ করতে পারল না অভিমন্যু
…অভিমন্যুর সঙ্গে দেখা-শুনা বন্ধ করা যায়; কিন্তু তার কথা ভাবা ি
কখনও বন্ধ করা যায়? ভেবে ফুরানো যায় না অভিমন্যুকে। তা
জীবনটা ভরে আছে অভিমন্যুতে, অথচ সারা জীবন কাটাতে হবে তা
না পেয়ে। রহমত বিবির অভিমন্যুর সংবাদ আনবার বিরাম নেই
মিনাকুমারীরও তার জন্য উৎকণ্ঠার সীমা নেই। কাকে সে দোষ দে
এর জন্য নিজেকে ছাড়া?……

রুকণী এসে তাকে কাগজ দেখায়।—এই ছাখ অভিমন্যুদের প্রস্তা
ক্যানটিনের খাবার আমরা নিয়ে গিয়েছি অনাথালয়ে। মিনাকুমা
জানে যে খবরটা সত্যি, কিন্তু এও জানে যে অভিমন্যু তার বিরু
কিছুতেই যেতে পারে না, যতই কাগজে কিছু লিখুক না কেন। এ হ
ঐ শিউচন্দ্রিকার কাজ। 'নেই কাজ, তো খই ভাজ'—আর কিছু পে
না তো আমাদের পিছনেই লাগো।—তুই যাই বলিস, অভিমন্যু আমা
বিরুদ্ধে লিখেছে, এ কথা আমি মরে গেলেও বিশ্বাস করি না।

রুক্মণী তাকে ঠাট্টা করে—"দীক্ষিতদের আমবাগানের কথাটা আজ
ভুলতে পারিসনি তুই দেখছি। তুই মেম্বর হয়ে যা ইউনিয়নের।"

এ কথায় মিনাকুমারীর হাসি আসে না। সে জানে যে, সে কাঁদা
পারে অভিমন্যুকে। সেই রুদ্ধ কান্নার ঢেউই এসে লাগছে তার ম
অষ্টপ্রহর। সে নিজেকে অপরাধী মনে করছে চব্বিশ ঘণ্টা; কিন্তু উপ
নেই। বর্তমানের আনন্দটুকুই সব নয়। আমের মুকুলের মধু ক'দিন ঝ
বছরে!…

চিঠি তো নয়—একটা যেন বোমা পড়েছে লেবার কমিশনা
টেবিলের উপর। কথার খই ফুটছে জয়নারায়ণ প্রসাদের মুখে। নুই
পড়েছে অভিমন্যুর মাথা। হতবাক্ হয়ে গিয়েছে বাইরের মজুরের দল
এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজারের গর্বোদ্ধত মুখের দিকে তাকানোর সাহস হারিয়ে

শিউচন্দ্রিকা। লেবার কমিশনার একটু নড়ে-চড়ে বসেন, তাঁর মেদবহুল শরীরটাকে চেয়ারখানা ভরে থাপে-থাপে বসিয়ে নেওয়ার জন্য। পেটের খোলা বোতামটা এঁটে, চশমার কাচ রুমাল দিয়ে মুছে, এক চুমুক জল খেয়ে, একবার গলা-খাঁকার দিয়ে তিনি যেন আবার নতুন করে তৈরী হয়ে নেন। শিউচন্দ্রিকা বোঝে যে, এ কমিশনার নতুন মানুষ। আর ইউনিয়নের পক্ষের কথা তাঁর মনে দাগ কাটতে পারবে না। রঙের তাস খেলেছে এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার। একেবারে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে সে বিরুপক্ষকে; তছনছ করে দিয়েছে এতক্ষণের শিউচন্দ্রিকার জমানো পুঁজি।

অভিমন্যু এখনও বার করে দিতে পারে তার ঝোলার মধ্যে থেকে মিনাকুমারীর চিঠিখান। তাতে হয়ত তার সম্বন্ধে কমিশনার সাহেবের একটা ভুল ধারণা কেটে যেতে পারে। মিনাকুমারী নিজে দিয়েছে এই চিঠি ম্যানেজারের কাছে। বিশ্বাস করতে মন চায় না; কিন্তু রূঢ় প্রমাণিত বাস্তবের সঙ্গে ঝগড়া করে লাভ নেই। কোন সন্দেহ করবার কারণ নেই জয়নারায়ণের কথায়। মিনাকুমারী বদলেছে। আগেও বোধ হয় এই রকমই ছিল; অন্য রকম থাকলে তবে তো বদলাবার কথা ওঠে। না, না, তা হতে পারে না। এত দিনের এত কথা, চোখের জল, আদর-অনুযোগ, চিঠির উপরের কালির আঁচড়গুলো, দীক্ষিতদের বাগানের আমের মুকুলের সৌরভ, সবই কি মিথ্যে? প্রতি পদে-পদে সে কি ভুল বুঝে এসেছে? অসম্ভব! হ'তে পারে না তা। সে নিজেকে যত দিয়েছে, বোধ হয় তার চাইতেও বেশী করে মিনাকুমারীকে পেয়েছে। কোন দিন তার রেশ যাবার নয়। সাফাই গাইবার জন্য সেই মিনা-কুমারীকে কি অভিমন্যু নীচু করে দিতে পারে? জয়নারায়ণ প্রসাদকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করবার জন্য সে কি বার করে দেবে মিনাকুমারীর চিঠিখান, সেই রকমই নাটকীয় ভাবে ভাঁজ খুলে-খুলে? অতটা অমানুষ

সে নয়!···অভিমন্যুর ভালবাসার ভিতর যে অনাবশ্যক পৌরুষের গ
মেশান ছিল, সেইটা মাথা-চাড়া দিয়ে ওঠে এতক্ষণে। সেইটাতে আ
দিয়েছে মিনাকুমারী, মনের উপর আঘাতের চাইতেও জোরে। অপ
করেছে তার ভালবাসার। এই জন্য মিনাকুমারী এত দিন খবর দেয়
বাস্তবের রুক্ষ আলোতে তার রঙীন স্বপ্ন-সাধ মুছে গিয়েছে মুহূর্তের মে
তার নিজের হাতে কাটা ঐ ক'টা কালির আঁচড়ের ধাক্কায় তার ম
ভিত্তি নড়ে গিয়েছে। এখানকার নথিপত্র, কথার ফুলঝুরি সব নির
মনে হচ্ছে এখন তার কাছে।···তবু মিনাকুমারী, সেই মিনাকুমা
থাকবে তার কাছে। তার নিজের জগৎ মুহূর্তের মধ্যে তছনছ হ
গিয়েছে বলে সে সেই মিনাকুমারীর নামে কলঙ্কের ছোঁয়াচ লাগতে দি
পারে না। এর ফল যাই হোক, লোকে তাকে যা ইচ্ছে মনে করুক, ত
সম্মান পথের ধূলোয় লুটিয়ে যাক, সে আর বাইরের জগতের তোয়
রাখে না। তবুও তার মনের কাছে, তার মিনাকুমারী একান্ত ভ
তারই থাকবে চিরকাল! এতগুলি সন্দিগ্ধ নগ্ন দৃষ্টির সম্মুখে, তার এব
আপন জিনিষটা সে আনতে পারে না, কিছুতেই।

সকলের হাব-ভাব লক্ষ্য করছে বাইরের মজুররা। প্রতিটি অঙ্গভঙ
মনগড়া অর্থ করে নিলেও মোটামুটি তারা ঠিকই বুঝেছে যে, হাকি
মন ঝুঁকেছে মিল-মালিকের দিকে। তারা চেঁচামেচি আরম্ভ ক
হাওয়া দিক্ বদ্‌লেছে। তেতে উঠেছে বারুদের স্তূপ। সবাই জা
চাইছে সারা ব্যাপারটা। আর বোধ হয় তাদের থামিয়ে রাখা গেল

জয়নারায়ণ প্রসাদ ঘরের ভিতর থেকে হাত তুলে মজুরদের শান্ত
বসবার জন্য অনুরোধ করেন। গত কয়েক মিনিটে তিনি এই ধৃ
দেখানর সাহস অর্জন করেছেন।

মজুরদের দিকে তাকাতে শিউচন্দ্রিকা সঙ্কোচ বোধ করে।
জোর করে উঠে দাঁড়িয়ে আরম্ভ করে দেয় মজুরদের দাবির বহস্, যে

থেকে বাধা পড়েছিল, ঠিক তার পর থেকে। কাগজ-পত্র সব সে একের পর এক দেখিয়ে যায়। তার শাণিত যুক্তির ধার আগে থেকে একটুও ভোঁতা হয়নি এখন, তবু যেন তা লেবার কমিশনারের মনে একটা আঁচড়ও কাটতে পারছে না। অভিমন্যুর চিঠি কমিশনার সাহেবের মনের সম্মুখে —যে বধির প্রাচীরটা তুলে দিয়েছে, তাতে ধাক্কা খেয়ে ঠিকরে ফিরে আসছে কথাগুলো। শিউচন্দ্রিকা নিজেই মনে মনে অনুভব করে যে, একটা সঙ্কোচের শৈত্যে তার কথার মধ্যে আবেগের উষ্ণতা একটু কমে এসেছে বোধ হয়। মজুরের দাবির ন্যায্যতার সঙ্গে এক জন ইউনিয়নের কর্মীর প্রেমপত্রের কোনই সম্বন্ধ নেই, এ কথা সে বোঝে। তবু যে সত্যনিষ্ঠার বলে সে কারও কাছে মাথা নোয়ায়নি কোন দিন, তারই ভিত্তি যেন দুর্বল করে দিয়েছে অভিমন্যুর চিঠিখানা। ত্রুটিহীন নিষ্ঠার সঙ্গে সে দাবি পেশ করে চলেছে কমিশনার সাহেবের কাছে, কিন্তু তিনি শুনছেন দায়সারা ভাবে, কর্তব্যের খাতিরে। আঙুল মটকে, টেবিলের উপর হাবিজাবি নক্সা এঁকে, হাই তুলে, নখ খুঁটে, তিনি তাঁর অধৈর্যতা চাপবার চেষ্টা করছেন। কথার তুবড়ি জয়নারায়ণ শান্ত হয়ে বসেছে, আর এখন তার হৈ-চৈ করবার দরকার নেই। ম্যাকনীল সাহেবের মুখে ফুটে উঠেছে প্রসন্নতার আভাস। অভিমন্যু ঝুঁকে পড়েছে টেবিলের উপর মুখ গুঁজে!

বাইরে ক্ষেপে উঠেছে মজুরের দল। জিতবার হাত পেয়েও আজ তারা হেরে যাচ্ছে। আর সব ঐ লক্ষ্মীছাড়া অভিমন্যুটার জন্য। আবার মুখ লুকোচ্ছে। আসতে দে শালাকে বাইরে একবার। তার পর দেখে নেব ঐ ভিজে বেড়ালটাকে!…হিংস্র জন্তুর মত তারা এখনই অভিমন্যুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। ঐ মিটমিটে শয়তানটাকে এখনই ছিঁড়ে কুটি-কুটি করে ফেলতে চায়।

আস্ফালন সব চেয়ে বেশী করছে ফিনিশিং ডিপার্টমেণ্টের সরযূ সিং, মনিঅর্ডারের রসিদের আঙুলের ছাপের উপর যে হাত বুলোতো।

শিউচন্দ্রিকার বলা শেষ হওয়ার পর, লেবার কমিশনার উভয় পক্ষকে ধন্যবাদ দেন। বিজয়ী বীরের মত ম্যাকনীল সাহেব, আর জয়নারায়ণ প্রসাদ গট-গট করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়। মজুররা ঝুঁকে আদাব করে, তাদের মোটরে পৌঁছুবার পথ করে দেয়।

কমিশনার সাহেব শিউচন্দ্রিকাকে বলে দেন যে, সন্ধ্যার পর তাদের যে দেখা করতে বলেছিলেন তাঁর সঙ্গে, সেটা আর হয়ে উঠবে না; তাঁর শরীরটা একটু খারাপ-খারাপ লাগছে।

অজস্র হাসি-টিটকারির মধ্যে থানার কনেষ্টবলরা অভিমন্যুকে কর্ডন করে ঘিরে ইউনিয়ন অফিসে পৌঁছে দিয়ে আসে।

ডি, এস, পি, আর এস, ডি, ও, সাহেব শিউচন্দ্রিকাকে চিন্তিত হতে বারণ করেন—"দু'জন পুলিস রাতে ইউনিয়ন অফিস পাহারা দেওয়ার জন্য থাকবে। ভয়ের কোন কারণ নেই।"

"এই কমিটি বিশেষ মনোযোগ ও সহানুভূতির সহিত কমরেড অভিমন্যুর দেওয়া কৈফিয়ৎ পাঠ করিয়া এই সিদ্ধান্তে পৌছিতেছে যে, তাঁহার বালকসুলভ লঘুচিত্ততা বলীরামপুরের মজুরদের স্বার্থের হানি করিয়াছে, বলীরামপুর-মজদুর-ইউনিয়নকে দুর্বল করিতে সাহায্য করিয়াছে, পার্টির সুনামে কলঙ্ক আনিয়াছে। এই দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্য পার্টি তাঁহার তীব্র নিন্দা করিতেছে। তিনি পার্টির এক জন পুরাতন সদস্য, এবং পার্টির প্রতি আনুগত্যে আজ পর্যন্ত তাঁহার কোন স্বেচ্ছাকৃত ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় নাই; এই কথা মনে রাখিয়া এই কমিটি তাঁহাকে পার্টি-সদস্যতা হইতে বঞ্চিত করিতে চাহে না। তবে তিনি মজুরদের মধ্যে কাজের অযোগ্য প্রমাণিত হইয়াছেন। তাঁহাকে মজদুর ফ্রণ্ট হইতে কিষাণ ফ্রণ্টএ বদলী করিয়া দেওয়া হউক এবং শিরিনিয়া গ্রামে পার্টির পক্ষ হইতে যে "বকাশ্‌ৎ" আন্দোলন চালাইবার কথা হইয়াছে, সত্বর কমরেড অভিমন্যুকে সেইখানে কাজ করিতে পাঠান হউক। সঙ্গে সঙ্গে এই কমিটি প্রাদেশিক কমিটিকে অনুরোধ করিতেছে যে, সম্ভব হইলে তাঁহারা যেন কমরেড অভিমন্যু সিংএর কার্যক্ষেত্র কয়েক মাস পর অন্য জেলায় বদলাইয়া দেন।"

৭-২-৪৭ তারিখে পার্টির জেলা কমিটির একটি বৈঠক হয় সদরে। তারই এই চার নম্বরের প্রস্তাবটার কপি এসেছে শিউচন্দ্রিকার সঙ্গে এই প্রস্তাবটার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ আছে; সেই জন্যই এখানা তার কাছে পাঠিয়েছে, কেতাদুরস্ত পার্টি অফিস। নীচে একটা ছাপ মেরে দিয়েছে রাবার ষ্ট্যাম্প দিয়ে; তাতে লেখা ইংরাজীতে—"সংবাদ জ্ঞাপনার্থ।" এ নিয়ম রক্ষা না করলেও কোন ক্ষতি হত না। কেন না, শিউচন্দ্রিকাই মূল প্রস্তাবটা এনেছিল পার্টি-মিটিংএ। কেবল প্রস্তাবটা আনা কেন,

মিটিংএর আগেই অভিমন্যুর কাণ্ড নিয়ে পার্টির মধ্যে তোলপাড় করা, তার কাছ থেকে কৈফিয়ৎ তলব করা, সব জিনিষের মূলে ছিল শিউচন্দ্রিকা।

শিউচন্দ্রিকার আনা মূল প্রস্তাবটা পার্টির মিটিংএ সংশোধিত ও পরিবর্তিত হয়। তার পর পাশ করা হয় উপরের ঐ চার নম্বরের প্রস্তাব।

এই নরম প্রস্তাবে খুশী হয়নি শিউচন্দ্রিকা। সে চেয়েছিল অভিমন্যুকে পার্টি থেকে বার করে দিতে। সকলে অবাক হয়ে গিয়েছিল। এ এক অদ্ভুত কাণ্ড! অভিমন্যুর হালকা স্বভাবের যেমন দুর্ণামও ছিল পার্টির ভিতর, তেমনি আবার ঐ হালকা স্বভাবের জন্যই সকলে তাকে ভালও বাসত খুব। তার কথায় কোন পার্টিসদস্য বিশেষ গুরুত্ব দিত না কোন দিনই, কিন্তু সকলেই তার কথা শুনতে ভালবাসত। সে কোন কথা বলতে আরম্ভ করবার বোধ হয় আগেই সকলে হাসতে আরম্ভ করে দিত—এইবার হাসির কথা আসছে জেনে।

না হলে কি আর শিউচন্দ্রিকার মত কড়া পাকের পার্টি-মেম্বরেরও এই খামখেয়ালী অভিমন্যুটার উপর এত টান ছিল? পার্টির সকলে ধরে নিত এটাকে শিউচন্দ্রিকার একটা দুর্বলতা বলে। পার্টি-মিটিংএ রসিক মেম্বররা শিউচন্দ্রিকাকে চটাবার জন্য মধ্যে মধ্যে গম্ভীর ভাবে প্রস্তাব আনত···অভিমন্যুকে অন্য কোথাও কাজ করতে দেওয়া হোক। পার্টির কাজ বাড়ানো দরকার অন্যান্য জায়গায়। বলীরামপুর-মজদুর-ইউনিয়ন শিউচন্দ্রিকা একাই সামলে নিতে পারবে।···শেষ হবার আগেই হাসির ধূম পড়ে যেত মিটিংএ। সভাপতি মশাই পর্যন্ত অতি কষ্টে হাসি চাপতে চাপতে সকলকে সভায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার জন্য অনুরোধ করতেন।···সেই শিউচন্দ্রিকা একেবারে বদলে গিয়েছে। অক্লান্ত নিষ্ঠায় তিল তিল করে গড়ে তোলা, তার

এত সাধের বলীরামপুর-মজদুর-ইউনিয়ন! অভিমন্যু এই ইউনিয়নের ভিত্তি নড়বড়ে করে দিয়েছে। আর এক মুহূর্তও সে অভিমন্যুকে ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে দিতে পারে না।…এ রকম লোকের জন্য সহানুভূতির প্রশ্ন তোলা উচিত হয়নি আপনাদের। ওর জন্য বলীরামপুরে পার্টির নাম ধূলোয় লুটিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই পার্টি-সদস্যতা থেকে সাসপেণ্ড করা উচিত ছিল। আমার সে অনুরোধ পার্টি-সেক্রেটারি রাখেননি। যাক, সে তো যা হবার হয়েছে। এখন ওকে পার্টি থেকে বার করে দেওয়া হক।…

মেম্বররা প্রথমটায় হাসি-মস্করা করে—চিঠির নায়িকার সঙ্গে তোমার কিছু সম্বন্ধ নেই তো শিউচন্দ্রিকা?

শিউচন্দ্রিকা রাগে জ্বলে ওঠে—ইউনিয়নের জীবন-মরণের প্রশ্ন, পার্টির সম্মান-অসম্মানের প্রশ্ন, তোমাদের হাসিও আসছে এই সময়? এখানে সকলে মিটিং করতে এসেছে না ছেলে-খেলা করতে এসেছে?…

…তবু অন্য মেম্বররা তার অনুরোধ রাখেনি। অভিমন্যুকে পার্টি থেকে বার করে না দিয়ে, তারা অভিমন্যুকে শিরনিয়ায় পাঠাবার প্রস্তাব পাস করেছে।…

যাক, তবু মন্দের ভাল বলতে হবে। শিউচন্দ্রিকা এখন আবার গিয়ে বলীরামপুরের মজুরদের কাছে বলতে পারবে যে অভিমন্যুকে ইউনিয়ন থেকে বার করে দেওয়া হয়েছে। ইউনিয়নে অমন লোকের স্থান নেই।…তার পর একটা, দুটো গরম বক্তৃতা জয়নারায়ণের বিরুদ্ধে দিতে পারলেই, আবার মজুররা আয়ত্তের মধ্যে এসে যাবে।

তার বিরুদ্ধে অভিযানে শিউচন্দ্রিকার এই অহেতুক উৎসাহে অভিমন্যু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। এতটা সে আশা করেনি।

শিউচন্দ্রিকা অবশ্য অভিমন্যুর সঙ্গে ব্যক্তিগত ব্যবহারে গত কয় দিন কোন বৈলক্ষণ্য দেখায়নি। বরঞ্চ তার সুখ-সুবিধা খাওয়া-দাওয়ার দিকে বেশী করে দৃষ্টি রেখেছে। সে অভিমন্যুকে যতটা ভাল ভাবে চেনে অতটা বোধ হয় আর কেউ চেনে না। পৃথিবীতে অত ভাল তার আর কাউকে লাগে না। সে অভিমন্যুর সঙ্গ চায় কিন্তু ইউনিয়নের মঙ্গল চায় তার চাইতেও তীব্র ভাবে। রাজনৈতিক সহকর্মী হিসাবে সে আর অভিমন্যুকে বিশ্বাস করতে পারে না। তবে পার্টি থেকে বেরিয়ে যাবার পর সে যদি অন্য কোন কাজ কর্ম করে, তাহলে তাদের দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব হতে পারে। তাকে পার্টিতে রাখলে, এখন পার্টির লাভের চেয়ে লোকসান বেশী। পরিষ্কার ভাবে যদি শিউচন্দ্রিকা অভিমন্যুকে বুঝিয়ে দেয় যে তার এখন পার্টি থেকে স্বেচ্ছায় বেরিয়ে যাওয়াই ভাল, তাহলে হয়ত অভিমন্যু হাসিমুখেই বেরিয়ে যেত পার্টি থেকে; কিন্তু কেউ কাউকে নিজের মনের কথা বলে না, তাই না এত কাণ্ড! এক দিন অভিমন্যুও বলেনি শিউচন্দ্রিকাকে মিনাকুমারীর চিঠির কথা। মিনাকুমারীও বলেনি অভিমন্যুকে যে, সে চায় অভিমন্যু রাজনীতির ক্ষেত্র ছেড়ে দিয়ে অন্য কাজ করুক। বললে হয়তো অভিমন্যু তার কথা রাখতো। তিন জনের কেউ কারও কাছে নিজের নিজের মনের কথাটা বলবার সুযোগ পায়নি। তাই এই ভুলবোঝাগুলো জট পাকিয়ে গিয়েছে এমন ভাবে যে কিছুতেই আর এখন খুলবার উপায় নেই।

অদ্ভুত স্বভাব অভিমন্যুর। শিউচন্দ্রিকার উপর তার রাগ হয় না, হয় অভিমান।…একেবারে কোমর বেঁধে লেগেছে তার পিছনে; তার উপর একটুও কি সহানুভূতির স্থান নেই শিউচন্দ্রিকার মনে?… সে কারও সহানুভূতি চায় না।…ভৃগুতে লিখেছিল যে উনত্রিশ বছর বয়সে তার আছে মহারিষ্টি। সে তো ঘটে গিয়েছে।

এর চাইতে মহাবিপত্তি আর তার কি হতে পারে? বলীরামপুরে আর সে নিজেও থাকতে চায় না। মিনাকুমারীর অত কাছাকাছি সে আর থাকতে সাহস করবে না। তাই কি ভৃগুতে লিখেছে যে তাকে প্রাণে বাঁচতে হলে সন্ন্যাস নিতে হবে? না, না, মিনাকুমারীই ছিল তার জীবনের গ্রহ; উনত্রিশ বছর বয়সের ফাঁড়াটা বিনা চেষ্টায় কেটে গিয়েছে।.........অসম্ভব! লোহার বাঁধন হয়তো চেষ্টা করলে ছিঁড়ে ফেলা যায়; কিন্তু মাকড়শার জালের সূক্ষ্ম তন্তু যত ছিঁড়তে যাও, ততই আরও জড়িয়ে ধরে সারা দেহে।...... কি অন্যায় করেছে সে?...কেবল একটানা কথার কচকচি! পার্টি পার্টি, পার্টি!...পৃথিবী শুদ্ধ সকলকে অপমানিত করবার জন্য না কি সে দায়ী! কিন্তু একটা লোকও তার লোকসানের কথা ভাবছে না, তার ভালবাসার যে কত বড় অপমান হয়ে গেল সে কথা ভাবছে না। কথাসর্বস্ব সবজান্তার দল! পাঁজরার হাড় গুণতে পারে এরা, কিন্তু মনের জগতের খোঁজ রাখে না। যার মনের জগৎ গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে ভেঙ্গে, বাইরের জগতে কি হ'ল না হ'ল, তা দিয়ে তার কি আসে-যায়! বলীরামপুরের মজুররা তার নামে গান বেঁধেছে। তারা আর কতটুকু অপমান করতে পারে অভিমন্যুর? ও-সব তার কানেও ঢোকে না। একটা একরত্তি মেয়ে, এর আগেই চরম অমর্যাদা দেখিয়েছে, তার নিজেকে নিঃশেষ করে দেওয়া দানের। ......অভিমন্যুর হঠাৎ মনে পড়ে যায় শিউচন্দ্রিকার সেই আটপৌরে কথাটা,—যে লোকটা মইয়ের সব চেয়ে নীচের ধাপে বসে আছে তাকে আর নামাবে কোথায় বল?...

মিটিং শেষ হওয়ার পর আর এক মুহূর্তও দাঁড়ায়নি সেখানে অভিমন্যু। গরমের দিনে রাতের সফরই ভাল,—এই বলে রাতারাতি বেরিয়ে পড়েছিল শিরনিয়ার দিকে। হাতে ছিল সেই খদ্দরের

ঝোলাটা। সম্বল ছিল মিনাকুমারীর সেই চিঠিখানা। আর মনের জমানো পুঁজিতে ছিল, সেই—সেই দিনকার আমের মুকুলের মাদকতা-ভরা সুবাস।...

গ্রেফ্‌তারী পরোয়ানা

মঘেলী থানার পুলিস সাব-ইনস্পেক্টরকে এতদ্বারা আদেশ দেওয়া যাইতেছে যে,

যেহেতু মঘেলী থানার শিরনিয়া গ্রামের অভিমন্যু সিং লুঠতরাজ, ডাকাতি, অবৈধ জনতার নেতৃত্ব করা, প্রভৃতি ফৌজদারী আইনের ধারায় অভিযুক্ত,

সেই জন্য সত্বর তাহাকে গ্রেফ্‌তার করিয়া ৮।২।৪৮ তারিখে আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হউক। ইহার অন্যথা যেন না হয়।

স্বাক্ষর ··দুষ্পাঠ্য

ম্যাজিষ্ট্রেট।

সরকার বাহাদুর বনাম অভিমন্যু সিং প্রভৃতির মোকদ্দমার ফাইলের এই কাগজখানায় যে দিন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব দস্তখৎ করেন, সে দিন তিনি জানতেও পারেননি যে, এখানার জায়গা লেখা আছে চিত্রগুপ্তের ফাইলে।

অভিমন্যুর শিরনিয়ায় চলে যাবার পর, এই ক'মাসে কত কি ঘটে গিয়েছে এই ছোট্ট দুনিয়াটার উপর। লেবার-কমিশনার যাবার পরই মিনাকুমারী আর রুকণীর মাইনে বেড়েছিল পাঁচ টাকা করে; হিন্দুস্থান আজাদ হয়েছিল পনরই আগষ্ট; কালু সর্দারের জেল হয়েছিল

ছয় মাসের ; ম্যাকনীল সাহেবের একবার খুব সর্দি হয়েছিল
এস, ডি, ও, সাহেব বদলী হয়ে গিয়েছিলেন টেলিগ্রাফের অর্ডারে ;
শিউচন্দ্রিকা আবার মজুরদের হাত করে ফেলেছিল, পূরো মজুরিতে
বছরে পনর দিন ছুটি দেওয়ানোর ব্যাপার নিয়ে ; আরও কত কাণ্ড
হয়তো ঘটে থাকবে পৃথিবীটার উপর।

রুকণী মিনাকুমারীকে বুঝিয়েছিল যে, তুই আর অভিমন্যুকে আমল
দিস না বলে সে মনের দুঃখে বলীরামপুর ছেড়ে চলে গিয়েছে। তুইও
আবার মনের দুঃখে একটা কাণ্ড-টাণ্ড করে ফেলিস না যেন।—হেসে
ফেটে পড়ে রুকণী। শুনে মিনাকুমারী চোখের জল চাপতে পারেনি।

হিন্দুস্থান আজাদ হবার পর ক'মাসই বা গিয়েছে ; এই আগষ্ট,
সেপ্টেম্বার, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর, আর এখন এই জানুয়ারী
চলছে ; মাত্র তো এই পাঁচটি মাস !

শিরনিয়া গ্রামে আজাদী পেয়েছে কেবল অযোধিয়া চৌধুরী।

সরকারের মাথায় এখন রাজ্যের ঝঞ্ঝাটের বোঝা ; পড়ে-পাওয়া
আজাদীর নানা রকম ফ্যাকড়া। কিন্তু এই ক'মাসে রাজ্যের
ঝঞ্ঝাটের বাধা না মেনে, এক হাঁটু কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে পোঁতা
শ্যামল ধানের চারাগুলি সোনার বোঝার ভারে এলিয়ে পড়েছে আলের
উপর। ধানের ধর্ম ধান মেনেছে।

আর জমিদারও তার ধর্ম ভোলেনি। এ পাঁচ মাস অযোধিয়া
চৌধুরীর লেঠেলরা লাঠিতে তেল দিতে ভোলেনি। অযোধিয়া চৌধুরী
নিজে মঘৈলী থানার দারোগা সাহেবকে ভেট পাঠাতে ভোলেনি
এক দিনও। পুলিশ নিমকহারাম নয় ;—যার নুন খায় তার গুণ গায়।
সেই ভরসাতেই অযোধিয়া চৌধুরী জমি থেকে বেদখল করতে সাহস
করেছে অগণিত রায়তদের। যারা বংশ-পরম্পরায় এই জমিতে অশ্রু
আর ঘামের রস জুগিয়ে এসেছে, নির্মম হাতে তাদের উপড়ে ফেলে দিতে

চায় শিরনিয়ার জমিদারবাবু,—স্বাধীন ভারতের রসের মধু যেন সে শিকড় না পায়। অযোধিয়া চৌধুরী জানে যে তার এই পাঁচ মাসের আজাদী. ফাঁসির আগের মিষ্টি খেতে পাওয়ার আজাদী; জমিদারী প্রথা লোপের আগে তাই তার এই মরণ-কামড়। কচ্ছপের মরণ-কামড়ও না কি মেঘের ডাকে আলগা হয়ে আসে। অজস্র শিকড়-ছেঁড়া রায়তদের কাতর আর্তনাদ জমিদার কানেও তোলেনি। এই অসহায় আর্তনাদকে তাই বজ্রের নির্ঘোষের রূপ দিতে এগিয়ে এসেছিল অভিমন্যুদের দল। আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল শিরনিয়ায় 'বকাশ্‌ৎ আন্দোলন'।

এই কাজেই অভিমন্যুকে পাঠিয়াছিল তার পার্টি।

দশ বছরের মধ্যে এমন ধান আর কখনও হয়নি এদিকে। যারা নিজে হাতে এই ধান পুঁতেছিল, তারা কি এর লোভ সামলাতে পারে? তাদের দাবি সামান্য। বাপ-ঠাকুরদার যুগ থেকে তারা যেমন ফসল ভাগ করে দিয়ে এসেছে জমিদারকে, এবারেও তাই দিতে চায়। তারা বোঝে না যে, দেশ আজাদ হয়েছে বলে এবার থেকে কেন অযোধিয়া চৌধুরী পূরো ফসলটাই নিতে চায়। তাদের না কি একটা খুদও নেবার অধিকার নেই, যদি নিতে চাও তো সেলামী দাও বিঘাপিছু দু'শো টাকা। এখন ফসলের ভাগ নিতে দিয়ে এই শয়তানদের জমির উপর কায়েমী দখল প্রমাণ করতে দেবে, এত বোকা আযোধিয়া চৌধুরীকে পাওনি!···

কোর্টে হাকিমের কাছে যাওয়ার নোটিশ পেয়েছে রায়তরা। পুলিশ মোতায়েন হয়েছে ক্ষেতে ক্ষেতে। সঙ্গে আছে জমিদারের লাঠিয়ালরা। শিরনিয়া উচ্চ প্রাইমারী স্কুলের বাড়ীটায় পুলিশরা ক্যাম্প করেছে। পাঁঠা-কাটা হচ্ছে সেখানে।

হঠাৎ একদিন খবর পাওয়া যায় যে, একজন হাকিম আসছেন সদর থেকে, ধান কাটাতে। এখন ধান কাটিয়ে রেখে দেবেন অযোধিয়া চৌধুরীর খামারে। পরে কাছারিতে জমির দখলের আর স্বত্বের বিচার হবে।

খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে কাস্তে নিয়ে জড় হয় হাড় জিলজিলে রায়তের দল। তারা বেশী আইন-কানুন বোঝে না, কেবল এটুকু জানে যে কাটা ধান যার খামারে উঠবে তারই থেকে যাবে। অযোধিয়া চৌধুরীর খামারে একবার উঠলে, আর মাথা কুটে মরে গেলেও, একটা বের করতে পারবে না তার কাছ থেকে। দারোগা পুলিশ হাকিম হুকুম—সকলকেই ও কিনে নেবে। তুমি জানো না অভিমন্যু ওকে, তাই তুমি মানা করছ আমাদের ধান কাটতে। তোমার নিজের হাতে পোঁতা হত, তবে না তুমি বুঝতে ক্ষেতের ধানের মায়া।···পুলিশের ভয় লাগছে অভিমন্যু তোমার?

চোখের জল রায়তদের শুকিয়ে গিয়েছে। শাণ দেওয়া কাস্তের উপর চোখের আগুনের ঝিলিক খেলছে ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ সকলের। মরিয়া হয়ে উঠেছে তারা।···

এগিয়ে যায় অভিমন্যু, সকলের চেয়ে আগে। না হলে তাকে ফেলে রেখেই এরা চলে যেত। সোনার খনির খোঁজ পেয়েছে তারা। কে কত আগে যেতে পারে তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছে।···এই আগে চলার প্রেরণা ছাড়া আর সব কিছু মুহূর্তের মধ্যে মুছে যায় অভিমন্যুর মন থেকে,—মিনাকুমারীর ছবি পর্যন্ত।

পুলিশ আর অযোধিয়া চৌধুরীর লেঠেলদের লাঠির সম্মুখে সেদিন দাঁড়াতে পারেনি তারা। ঝাণ্ডা হাতে অভিমন্যুর উপরই তাদের আক্রোশ ছিল সব চাইতে বেশী। লাঠি পড়েও ছিল অনেক তার উপর; বুকে, পিঠে, মাথায়।—নে! এই নে! আর একটা নে! আর এক বোঝা নে পিঠে! আর একটা ধানের বোঝা নে মাথায়! হারামজাদা!···

অজ্ঞান হয়ে ক্ষেতের আলের উপর পড়ে গিয়েছিল অভিমন্যু। বিরিঞ্চি, আর শিরনিয়ার আর কয়েক জন মিলে তাকে ধরাধরি করে নিয়ে এসেছিল, গাঁয়ের মধ্যে গুখান্নু মণ্ডলের বাড়ীতে।

সেখানেই তার হয় জ্বর, আর বুক-পিঠে অসহ্য বেদনা। এরই মধ্যে গাঁয়ের চৌকিদার এক দিন চুপি-চুপি খবর দিয়ে যায় যে, ভোর রাত্রে দারোগা-পুলিশ আসবে গ্রেফ্তারি পরোয়ানা নিয়ে অভিমন্যুকে গ্রেপ্তার করতে ; যা ভাল বোঝ কর।

বুঝবে আর কি ছাই। বিরিঞ্চি রাতারাতি শুখানু মণ্ডলের গরুর গাড়ীতে করে অভিমন্যুকে নিয়ে আসে বলীরামপুর-মজদুর-ইউনিয়ন অফিসে। আর যেতই বা কোথায়? এক নিয়ে যেতে পারতে তার কাকার বাড়ীতে। হয়তো তিনি জায়গা দিতেন না। আর পুলিশও সব চেয়ে আগে সেখানেই খোঁজ করবে। অনেক ভেবে-চিন্তেই বিরিঞ্চি অভিমন্যুকে ইউনিয়ন অফিসে নিয়ে এসেছিল। অভিমন্যুর বুকের আর গলার ঘড়্ঘড়ানির শব্দটা তার ভাল ঠেকেনি।—ডাক্তার আছে বলীরামপুরে ; ভাল করে চিকিৎসা হতে পারবে।...পার্টির লোকের সেবা-শুশ্রূষা পার্টির ইউনিয়ন অফিস থেকে যত ভাল ভাবে হতে পরবে, তেমন আর কোথাও হবে না।...তার উপর সেখানে আছে শিউচন্দ্রিকা, অভিমন্যুর অন্তরঙ্গ বন্ধু।...এই সব সাত-পাঁচ ভেবে বিরিঞ্চি নিয়ে এসেছিল অভিমন্যুকে বলীরামপুর মজদুর-ইউনিয়নের অফিসে।...

মিল কম্পাউণ্ড আর ইউনিয়ন অফিসের মধ্যে মাত্র একটা চওড়া পাকা রাস্তার ব্যবধান। অফিস ঘরটায় চব্বিশ ঘণ্টাই লোক যাতায়াত করে। তাই অভিমন্যুর স্থান হয়েছে তার পাশের কামরায়। এই ঘরেই তারা আগেও শুতো। ঘরখানা ভাল ; বেশ একটি বড় জানালা আছে পথের দিকে। তবে জানালার কাচের সার্সি অধিকাংশ সময়ই বন্ধ রাখতে হয় কারখানার ধোঁয়ার ভয়ে। কাচের সার্সিটার মধ্য দিয়ে দেখা যায় কারখানার উঁচু দেওয়াল ; উপরে খুঁটির সঙ্গে কাঁটা তার দেওয়া—মজুররা বলে যে তারের মধ্যে বিজলী দেওয়া আছে ; ছুঁলেই

লোক মরে যাবে। তারও উপর দিয়ে দেখা যায়, কালি-ঝুলমাখা কারখানার চিমনিটা। তার মুখ দিয়ে অষ্টপ্রহর মিশকালো ধোঁয়া বেরুচ্ছে পাক খেয়ে খেয়ে। মৃদু পশ্চিমে বাতাসে ধোঁয়ার কুণ্ডলীর শুঁড়টা এই জানালার দিকে ছুটে আসছে।

বন্ধুর চিকিৎসা করাবার পয়সা পাবে কোথায় শিউচন্দ্রিকা। কিষাণ-ফ্রন্টের কর্মীদের তবু খাওয়া-দাওয়াটা জুটে যায় গাঁয়ের ভিতর, কিন্তু এখানে তো সেটা পাওয়াও শক্ত। ওষুধ-বিষুধ, ইনজেক্সন, ডাক্তারের ফি, পথ্য, এ সব সে পাবে কোথা থেকে? টাকা জুটোতে পারলেও হয়তো ভাল করে চিকিৎসা সম্ভব ছিল না। বেশী লোক জানাজানি হয়ে গেলে শেষ পর্যন্ত হয়তো পুলিশে তাদের শিকারের সন্ধান পেয়ে যেত।...

মিলের ডাক্তার বাবুর কাছে গিয়েছিল শিউচন্দ্রিকা সেই দিনই রাত্রিবেলা। ছা-পোষা মানুষ তিনি; চাকরীর ভয়ে আসতে রাজী হননি। তাঁকে দোষ দেয়নি শিউচন্দ্রিকা।...মিল-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মজুরদের ঝগড়া চরমে উঠেছে দিন কয়েক থেকে! মন-কষাকষি চিরকালই থাকে, কিন্তু এখন আবহাওয়া হয়ে উঠেছে একেবারে তেতো। নিত্যি-নূতন কাণ্ড হচ্ছে, মিল-এলাকায়। মজুরদের রুদ্ধ আক্রোশ অতর্কিত ভাবে বেরিয়ে আসছে নিত্য-নূতন খাতে। কোন দিন রামভরোসা সর্দারের মাথা ফাটছে রাতের অন্ধকারে, কোন দিন বা ম্যাকনীল সাহেবের গাড়ী ঘিরে ধরছে তারা, তাঁর কথা আদায় করবার জন্য। লাল-পাগড়ি ভরা ভ্যান মধ্যে মধ্যে টহল দেয় ইউনিয়ন অফিসের ধারের পাকা রাস্তাটিতে। সেই দিনই আবার একটা নূতন হুজুগ উঠেছিল; কর্তৃপক্ষ চার নম্বরের গেট বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এটা ইউনিয়ন অফিসের দিকের গেট; মিলের 'তাঁত-ঘর'টাও এই দিকেই পড়ে। সেই জন্য এদিক দিয়ে মজুরদের

বেশী যাতায়াত জয়নারায়ণ প্রসাদ পছন্দ করছিল না। সব মজুরর সেদিন পুলিশ আর দারোয়ানদের উপেক্ষা করে চার নম্বর গেটে সঙ্গে একখান মই লাগিয়েছিল। তাই দিয়ে প্রত্যেকটী মজুর চার নম্বরের গেট টপকেই আজ ভিতরে ঢুকেছিল—অন্য তিনটে খোলা গেট দিয়ে কেউ ঢোকেনি। একটুর জন্য একটি বড় রকমের গোলমাল হতে হতে বেঁচে গিয়েছে আজ এই নিয়ে।

এই আবহাওয়ার মধ্যে ডাক্তার বাবু আসতে না চাইলে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না।···আবার যে ধরণের রুগী!···ফেরারী আসামী শুনেই ডাক্তার বাবুর খুদে খুদে চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিল ভয়ে। "অ্যাব্‌স্কণ্ডার!" সত্যিকারের ফেরারী রাজনৈতিক আসামী তিনি এর আগে কখনও দেখেননি; বুনো গণ্ডারের গায়ে হাত দেওয়াতে এর চাইতে বিপদ কম। না না, শিউচন্দ্রিকা বাবু, আমাকে মাপ করবেন।

সে-রাত্রে শিউচন্দ্রিকা চলে এসেছিল।

কিন্তু এর পরের দু'দিনে অভিমন্যুর অসুখ আরও বেড়ে যায়। বুকে-পিঠে অসহ্য ব্যথা; চার ডিগ্রী জ্বর; ব্যঞ্জনাহীন চোখের লাল শিরা-উপশিরাগুলোর প্রত্যেকটা দেখা যাচ্ছে; ভয় হয় গলার ঘড়ঘড় শব্দ, আর অবিশ্রান্ত প্রলাপ, পাকা সড়কের উপর থেকে কেউ আবার শুনে ফেলল না কি!···

আর থাকতে না পেরে শিউচন্দ্রিকা আবার গিয়েছিল ডাক্তার বাবুর কাছে। ডিস্পেন্সারীতে ডাক্তার বাবুর হাত চেপে ধরে একবারটি যাওয়ার জন্য মিনতি জানিয়েছিল আবার। যে শিউচন্দ্রিকার নাম শুনলে দুর্দান্ত ম্যানেজার ম্যাকনীল সাহেবের অফিস-ঘরের রিভল্‌ভিং চেয়ার তাঁর অজ্ঞাতেই ঘুরে যায়, সেই শিউচন্দ্রিকা ভিক্ষা চাইছে ডাক্তার বাবুর কাছে। ডাক্তার বাবু সেদিন আর শিউচন্দ্রিকার

অনুরোধ ঠেলতে পারেননি। গভীর রাত্রে চুপি-চুপি এসেছিলেন ইউনিয়ন অফিসে, কম্বল মুড়ি দিয়ে।

"পয়সা নেই আমাদের, ডাক্তার বাবু। সে কথা বুঝে ওষুধ-বিষুধের ব্যবস্থা দেবেন।"—কথা কয়টি বলার সময়, যে শিউচন্দ্রিকা প্রত্যহ নিজেদের নিঃস্বতার গর্ব করে, কুণ্ঠায় তার গলার স্বর প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছিল।

ডাক্তারের কাছে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। অভিমন্যুর বুকে পিঠে লাঠির দাগগুলো ডাক্তার বাবুকে দেখিয়েছিল শিউচন্দ্রিকা।

ডাক্তার বাবু দেখে-শুনে বলেন, এ এক রকম নিউমোনিয়া ; বুকে-পিঠে চোট লাগলে অনেক সময় এমন হয়। কাল জ্বরটা ছেড়ে যাবে বোধ হয়। সে সময়টা একটু বিশেষ সাবধান হয়ে থাকতে হবে। বেশী চেঁচামেচি হট্টগোল যেন না হয় সে সময়টায়। রুগীকে নড়া-চড়া করতে দেবেন না তখন।...দেখবেন, যেন উত্তেজিত না হয়ে পড়ে কোন কারণে। বেশী কথা বললেও ক্লান্ত হয়ে পড়বে রুগী।...দরজা-জানালাগুলো খুব ভাল করে খুলে রেখে দেবেন। খোলা হাওয়ার মত উপকারী জিনিষ নেই এর পক্ষে। এখন থেকে একটু অক্সিজেন দিলে নিশ্বাস ফেলতে এতটা কষ্ট হত না।...

অক্সিজেনের কথাটা বলে ফেলেই ডাক্তার বাবুর মনে পড়ে যে সেটা সম্ভব নয়,...তাহলে অক্সিজেন দেওয়ার জন্য এক জন ডাক্তারের থাকার দরকার—টাকা খরচের দরকার—

আচ্ছা, আমি এক রকম ট্যাবলেট দেব, নিয়ে আসবেন।—কালই বোধ হয় 'ক্রাইসিস্'। জ্বরটা ছাড়ার সময়, আর তার পর বেশ সাবধান থাকবেন। ঠিক যেমন যেমন বলে গেলাম—

ডাক্তার বাবু এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচেন ; রাস্তায় আবার কেউ চিনে না ফেলে।—'স্পাই-টাই রেখেছে কি না পুলিশ ইউনিয়ন অফিসের উপর, কে জানে !—

অভিমন্যুর অসুখের জন্য আজ কয়েক দিন থেকে শিউচন্দ্রিকার রুটিন-বাঁধা জীবনে বিশৃঙ্খলা এসেছে। রুগীর শিয়রে বসে বসে সে আকাশ-পাতাল ভাবছে। দেওয়ালের ক্যালেণ্ডারের তারিখটার উপর হঠাৎ নজর পড়ে,—গোলমালে দু'দিন থেকে বদলানো হয়নি তারিখটা। আজ তিরিশে জানুয়ারী, শিউচন্দ্রিকা তারিখটা বদলে দিয়ে আবার এসে বসে। একটা নামজাদা বিলিতী ব্রাণ্ডির বিজ্ঞাপন ক্যালেণ্ডারে। ডাক্তার বাবু বলেছিলেন একটু 'ষ্টিমুলাণ্ট' এনে রাখতে ; অভিমন্যুর জ্বর ছাড়বার সময় আজ দরকার হতে পারে। বিজ্ঞাপনের ক্যালেণ্ডার বিনা পয়সায় পাওয়া যায়, কিন্তু বিজ্ঞাপনের ওষুধ ?—সেই পয়সার কানা-গলিতে ধাক্কা খেয়ে মনটা বার-বার ফিরে আসে।

অদ্ভুত ফরমাশ এই ডাক্তারদের। বলবে অক্সিজেন দাও। অক্সিজেনের দাম কোথা থেকে আসবে তার ঠিকানা নেই।—পয়সা খরচ যাতে না হয়, এমন চিকিৎসার কথা বললাম তো, এমন সব জিনিষ করতে বলল যা কোন দিনই সম্ভব নয়। যাদের জানালা খুললে চিমনির ধোঁয়ায় ঘর ভরে যাবে, তাদেরও বলে, জানালা খুলে রুগীকে তাজা হাওয়া খাওয়াতে।—মিলের 'তাঁত-ঘর'এর শব্দে যে ঘর অষ্টপ্রহর ভূমিকম্পের মত থর-থর করে কাঁপছে সে ঘরের রুগীকেও বলবে, চুপচাপ নিরিবিলির মধ্যে রাখতে। সম্মুখের রাস্তা দিয়ে গাড়ী-ঘোড়া লোক-জনের হট্টগোল বন্ধ হবে কি করে? ডাক্তার সাহেব তো হুকুম দিয়েই খালাস!

বিরিঞ্চিকে শিউচন্দ্রিকা বসিয়ে রেখেছে পাশের অফিস-ঘরে, কেউ এলে খবর দিতে। বলা নেই, কওয়া নেই, কেউ হুট করে এ ঘরে ঢুকে পড়তেও তো পারে।

বন্ধুর শিয়র ছেড়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি আরম্ভ করেছে শিউচন্দ্রিকা। সে কিছুতেই আর নিজের মনকে সংযত করতে পারছে না। আফিস-ঘরে গিয়ে একবার বিরিঞ্চিকে বলে আসে—কেউ এলে বলবে যে আমার

সঙ্গে এখন দেখা হবে না, কিছুতেই না। আর কেউ যেন এখানে চেঁচামেচি না করে

কি করবে ভেবে পায় ন শিউচন্দ্রিকা। লেবার-কমিশনারের সম্মুখে মজুরদের হয়ে এক ঘণ্টা অনর্গল বলে যাবার সময় তার কথার খেই হারিয়ে যায় না; কন্তু ডাক্তার বাবুর নির্দেশের কথা ভাবতে ভাবতে সব যেন ঘুলিয়ে যাচ্ছে। চোখের এক ইসারায় সে এখনি মিলের দশ হাজার মজুরকে ক্ষেপিয়ে তুলতে পারে, কিন্তু সে পারে না তার বন্ধু অভিমন্যুকে- মরণের মুখ থেকে ছিনিয়ে আনতে। কি করে পারবে? ঐ যে কালো চিমনি-দানবটা নিশ্বাস ফেলবার সময় ছড়িয়ে দিচ্ছে বিষ জানালাটা লক্ষ্য করে,—ফণাধরা সাপের মুখ থ:ক পচকারির মত ছুটে আসছে বিষের ধারা শক্রর চোখের দিকে; তা সে কি করে বন্ধ করবে? চিমনিটার ভিতর যদি সে ঢুকেও বসে থাকে, তাহলেও বন্ধ হবে না তার ধোঁয়ার কুণ্ডলী।···সম্মুখের রাস্তাটা যদি সে খড় দিয়ে ঢাকিয়ে দিতে পারে, তাহলে হয়ত বন্ধ হতে পারে, একার চাকার শব্দ, কারখানার মাল-বোঝাই মোটর ট্রাকগুলোর আওয়াজ!···

শিউচন্দ্রিকার হাসি আসে যে মানুষী অসম্ভব-অসম্ভব কথা সব সে ভাবছে।···কি লাভ এ সব কথা ভেবে?···কি করে সে বন্ধ করবে কারখানার অজস্র যন্ত্রের আর সম্মুখের তাঁত-ঘরের বিভিন্ন ধ্বনির উৎকট ঐকতান?···ময়দানবের খোকাদের খেলাঘরের হুটোপুটি কার সাধ্যি থামায়?···কট্‌কট্‌ করে দাঁতে দাঁতে শব্দ করতে করতে আগিয়ে আসছে—এই এখানে,—মুহূর্তের মধ্যে বেলটিংএর একটানা ঘুরুণীর ঘোড়ায় চড়ে কোথায় চলে যাচ্ছে!···ঐ বক-রাক্ষসের বরাদ্দ কয়লার খোরাক, বয়লারের জঠরে চালাতেই হবে।···এই সব কোন বাঁধা-রুটীনের কাজে পান থেকে চুণ খসবার উপায় নেই।···উপায় নেই; কোন উপায় নেই অভিমন্যুকে বাঁচাবার।···উপরের হুকুম না এলে

ম্যাকনীল সাহেবও মিল বন্ধ করতে পারে না। পারে একমাত্র মজুররা। এই দশ হাজার মজুর ইচ্ছা করলে কি না করতে পারে? তারা যদি কাজে না যায়, তাহলে মুহূর্তের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়বে এই বিশ্বকর্মার কামারশালা। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে সত্যিই এর মরণ-কাঠি জিয়ন-কাঠি শিউচন্দ্রিকার হাতে। কিছু দিন থেকে মজুররা এক-পা এগিয়েই আছে ধর্মঘটের দিকে। না বলতেই কত দিন দল বেঁধে কাজ ছেড়ে চলে আসে। শিউচন্দ্রিকা লাগাম টেনে তাদের সামলে রেখেছে বলেই এখনও সত্যিকারের ধর্মঘট আরম্ভ হয়নি। চার নম্বরের গেট বন্ধ করার অজুহাতে দেবে না কি হরতাল করিয়ে সে?...তাহলেই অভিমন্যু বাঁচে, ডাক্তার বাবু জ্বর ছাড়বার পর যা যা করতে বলেছেন সব করা যায়; জানালা খুলে রাখা যায়; ধোঁয়া থাকবে না, সূচটি পড়বার শব্দ হবে না অভিমন্যুর ঘরে।...এর লোভ কম নয়।...অভিমন্যু যদি না বাঁচে তাহলে এর জন্য দায়ী হবে শিউচন্দ্রিকা নিজের মনের কাছে।......তারই জন্য অভিমন্যুকে চলে যেতে হয়েছিল কিষাণ-ফ্রন্টে কাজ করতে।...প্রথম এই নারানপুর-মজদুর-ইউনিয়ন গড়ে তোলবার সময় অভিমন্যু তার চাইতে কম পরিশ্রম করেনি। কত-দিন তাদের দু'জনের একসঙ্গে না খেয়ে কেটেছে সে সময়। আর আজ অভিমন্যু এখানে আছে চোরের মত লুকিয়ে।......কিন্তু তার বন্ধুর প্রাণ বাঁচাবার জন্য সে অকারণে মজুরদের হরতাল করতে বলতে পারে না, মজুরদের স্বার্থ, ইউনিয়নের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে পারে না।...সে কর্তৃপক্ষের প্রতিটি চাল বোঝে। জয়নারায়ণ প্রসাদ এখন চায় যে মজুররা একটা গণ্ডগোল করুক। সেই অজুহাতে ইউনিয়নকে দায়ী করে পিষে ফেলে দেবে সে এটাকে। সরকার বাহাদুর আর পুলিশকে দিয়ে তাহলেই সে করাতে পারবে—শিউচন্দ্রিকাকে এ জেলা থেকে 'এক্সটার্ণ' করে দেবার অর্ডার।...মজুরদের চটাবার জন্যই চার

নম্বর গেট বন্ধ করানো হয়েছে, এ কথা বেশ ভাল ভাবেই জানে শিউচন্দ্রিকা।...এখন হরতাল করতে বলা মানে মজুরদের আত্মহত্যা করতে বলা।...মজুরদের ভবিষ্যতের ভাল-মন্দ তার হাতের মুঠোয়। সে কিছুতেই বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবে না তাদের সঙ্গে, তার অন্তরঙ্গ বন্ধুর জন্য।......

"অযোধিয়া চৌধুরী!...ধানের পাহাড়!"......অভিমন্যু প্রলাপ বকছে। শিরনিয়ার অযোধিয়া চৌধুরীর কথা বলছে। মধ্যে মধ্যে মিনাকুমারীর কথাও কি সব বলে—সব কথা বোঝা যায় না।...... শিউচন্দ্রিকা অস্থির হয়ে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ায়। অভিমন্যুর হাত-দেখানোর কথা তার মনে পড়ে। কাশীর ভৃগু না কি তাকে বলেছিল যে তার উনত্রিশ বছর পরমায়ু। কোন দিন সে বিশ্বাস করেনি এ কথায়।... অভিমন্যুকে বাঁচাতেই হবে, যেমন করে হোক।

বন্ধ জানালার সার্সির ভিতর দিয়ে বাইরের জগতটার দিকে তাকিয়ে থাকে শিউচন্দ্রিকা। সন্ধ্যা নেমে আসছে। কালো চিমনিটাতেও লালচে আভা লেগেছে। নিরবচ্ছিন্ন ধোঁয়ার অজগরটা যেন এই জানালাকে নিশানা করেই আগিয়ে আসছে—নিশ্চয়ই পশ্চিমে হাওয়া হচ্ছে।...... এখন হাওয়ার দিক্ যদি যায় বদলে, তাহলে এক কেবল ধোঁয়াটা আজ আর কাল এ দিকে না আসতে পারে। শিউচন্দ্রিকা বোঝে যে জানুয়ারীর শেষে বলীরামপুরে পশ্চিমে হাওয়া ছাড়া আর অন্য কোন হাওয়া বয় না। এ তারা চিরকাল দেখে আসছে। এই হাওয়াই আর দিন কয়েক পর থেকে আরও জোর হবে, আর পশ্চিম থেকে পূর্ব দিগন্তে উড়িয়ে নিয়ে যাবে রাজ্যের ঝরা পাতা। তবু বলা যায় না......

বিরিঞ্চি, আলো দিয়ে যায় ঘরে।

বিরিঞ্চি আজকের কাগজখান দিয়ে যেও তো!...কাগজে আবহাওয়ার পৃষ্ঠা শিউচন্দ্রিকা জীবনে কোন দিন পড়ে না।......এখন সেটাকে একবার

দেখে নিতে ইচ্ছা করে—যেন নিজেকে লুকিয়েই সে দেখছে। জানে যে আজ রাতের মধ্যে হাওয়ার দিক্ বদলাতে পারে না, তবুও কাগজখানা খুলবার সময় তার মনে ক্ষীণ আশা জাগে—হতেও তো পারে।…ঝড়, বাদল, এলোমেলো হাওয়া—কত কি !—যা ভেবেছিল ঠিক তাই—কাগজে লিখেছে—কাল বিকালের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হবে না আবহাওয়ার।—অপ্রত্যাশিত নয়। তবু মনটা যেন আরও খারাপ হয়ে যায়।

সাঁঝের অন্ধকারের মধ্যে তবু একটা রহস্য আছে, কিন্তু এই হতাশার অন্ধকারের মধ্য দিয়ে নিকট ভবিষ্যের চিত্রের প্রত্যেক রেখা স্পষ্ট মূর্ত হয়ে ওঠে শিউচন্দ্রিকার কাছে। সত্যিই মনে বল পাচ্ছে না শিউচন্দ্রিকা। অভিমন্যুর অস্থিরতা একটু কমেছে। ঘুমুলো না কি !

কপালে হাত দিয়ে দেখে,—জ্বর বোধ হচ্ছে কমের দিকে।

হঠাৎ রাস্তার দিকে একটা কোলাহল শোনা যায়। শিউচন্দ্রিকা সার্সির ভিতর দিয়ে পথের দিকে তাকিয়ে দেখে, ছেঁড়া-ছেঁড়া ভিড় —ছোট-ছোট দল কি নিয়ে যেন জটলা করছে। চার নম্বর গেটের উপরের আলোটা সম্মুখের রাস্তায় এসে পড়েছে। এক জন লোক হাত-পা নেড়ে কি সব যেন বোঝাচ্ছে। জয়নারায়ণ প্রসাদ আবার একটা নতুন কিছু কাণ্ড করল না কি কারখানায়, পুলিস-টুলিশ এনে ?

বিরিঞ্চি ছুটে আসে পাশের ঘর থেকে। উত্তেজনায় তার মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। "শুনেছ শিউচন্দ্রিকা, কি ভয়ানক খবর ! রেডিওর খবর, ম্যাকনীল সাহেব বলেছে।

তারপর সবই শোনে শিউচন্দ্রিকা। অসম্ভব ! বিশ্বাস হয় না ! মহাত্মাজীর উপর চালাবে গুলী ! প্রার্থনা-সভায় ? মনে পড়ে, ছোটবেলায় তার দুধের মত সাদা পায়রাটাকে জমিদার বাবুর ছেলে গুলতি দিয়ে

মেরেছিল! পায়রা-বোমের উপর থেকে ঝকঝকে নিকানো উঠানে হঠাৎ মুখ থুবড়ে পড়েছিল তার আদরের ঢুধিয়াটা। লাল হয়ে উঠেছিল বুকের ধবধবে সাদা রেশমের মত নরম পালকগুলো। স্বচ্ছ লাল ব্যথাকাতর চোখ দু'টো আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে এসেছিল—তারই হাতের মধ্যে। এখনও যেন পালকের নীচের গরমটুকু হাতের তেলোয় লেগে রয়েছে।

বিরিঞ্চি, একটু বস এ ঘরে।

শিউচন্দ্রিকা ছুটে বার হয়ে পড়ে রাস্তায়। এখন তার মাথা ঠিক রাখতে হবে। আবার একটা দাঙ্গা হয়ে যাবে না তো? মজুররা তাকে ঘিরে ধরেছে। খবর শোনবার সঙ্গে সঙ্গেই সকলে বেরিয়ে এসেছে কাজ ছেড়ে। কেন, জিজ্ঞাসা করলে কেউ তার উত্তর দিতে পারবে না। সহজাত অনুভূতি কি আর যুক্তি দিয়ে বোঝাবার দরকার হয়? কারখানার এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার কি অন্য অফিসাররা, কেউ এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসাও করেনি। কেউ বারণ করেনি তাদের। বাপ মরবার খবর পেলে কি ফোরম্যান সাহেব বসে থাকতো কারখানায়?

হাতের কাজ সেরে যখন শিউচন্দ্রিকা বাড়ী ফেরে তখন বেশ রাত হয়ে গিয়েছে। অভিমন্যু শান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে। জ্বর এখন খুব কম।

শিউচন্দ্রিকার বিষাদের বোঝা যেন একটু হালকা-হালকা মনে হয়। যতক্ষণ বাইরে ছিল, ততক্ষণ সে ছিল অন্য মানুষ। শোকের বোঝায় বাইরের জগতটা পিষে যাচ্ছে এখন, কিন্তু রুগীর জগতই আলাদা। বাইরের পৃথিবীর নাড়ীর স্পন্দন এখানে পৌছায় না। এখানে শিউচন্দ্রিকাও অন্য মানুষ। ন্যায়নিষ্ঠ ট্রাষ্টীর মত, এখানে সে তার যখের ধন আগলে বসে আছে।

অভিমন্যু তাহলে বাঁচবে। ডাক্তার বাবু যা যা বলেছেন করতে,

সবই এখন সম্ভাবনার ভিতরের জিনিষ। ডাক্তার বাবু বলেছিলেন ঠিকই—জ্বরটা ছেড়ে যাচ্ছে ?···জ্বর ছাড়বার পর সে খুলে দেবে জানালাটি। কাল কোন মজুর যাবে না কাজে। মিল বন্ধ থাকবে। একটুও শব্দ আসবে না 'তাঁত-ঘর' থেকে। সারা সহরে থাকবে হরতাল। গাড়ী-ঘোড়া, মোটর ট্রাক কিছুই চলবে না সম্মুখের রাস্তায়।—ভৃগুর অমোঘ নির্দেশ' ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে এই কারখানার মজুরের দল। দিল্লীর প্রার্থনা-সভার এক অবাঞ্ছিত অপ্রত্যাশিত ঘটনা কি করে এখানকার এক অসম্ভবকে সম্ভব করিয়ে দিয়েছে! যত দিন বেঁচে ছিলে মহাত্মাজী, তোমার আশীষ দু'হাতে বিলিয়েছো ; তোমার তিরোধানের পরও কি তার ঢেউ এসে লাগছে এই দূর-দূরান্তরে ? কৃতজ্ঞতার আবেগে ক্ষণিকের জন্য শিউচন্দ্রিকার ইচ্ছা করে এই সর্বজ্ঞ অদৃশ্য শক্তিতে বিশ্বাস করতে। নিজেকে মনে পড়তেই সে সামলে নেয়। তার জীবনের ভিত্তি যুক্তির ফ্রেমে গড়ে তোলা। একটা সামান্য কাকতালীয় ঘটনাকে নিয়ে মাথা ঘামিয়ে অযথা ক্ষণিকের দমকা ভাবপ্রবণতার উচ্ছ্বাসে, সে এই ভিত্তিকে দুর্বল হতে দিতে পারে না।······

অভিমন্যুর কপালটা ঘামছে।

বিরিঞ্চি, একটু জল গরম করে রেখো।

আছে সব ঠিক।

প্রথমটা ভয়ই লেগে গিয়েছিল শিউচন্দ্রিকার. মাঘের শীতে ভোরবেলা, সে কি ঘাম! বিছানা-বালিস ভিজে জবজবে হয়ে যাচ্ছে। মিনিটে মিনিটে জ্বর কমে আসছে। ঠাণ্ডা হয়ে আসছে গা-হাত-পা। ডাক্তার ঠিকই বলেছিলেন—একটু কিছু ষ্টিমুলেণ্ট এনে রাখা উচিত ছিল।······নেতিয়ে পড়া দেহটার প্রতি রোমকূপ থেকে জীবনের শীর্ণ ধারার শেষ বিন্দু পর্যন্ত বেরিয়ে গেল বুঝি! শিউচন্দ্রিকার এত চেষ্টা,

এত পরিশ্রম সব বুঝি ব্যর্থ হয়।···সাতানব্বুই!······ছিয়ানব্বুই! ······পচানব্বুই পয়েণ্ট ছয়!···ঠাণ্ডা হিম হয়ে গিয়েছে তার সারা দেহ। বিরিঞ্চি আর শিউচন্দ্রিকা কেউ কারও দিকে তাকাতে পারে না ভয়ে।—— নিখাদ থেকে খাদে নামবার পথে জীবনের স্বর পথ হারালো নিশ্চয়—বিরিঞ্চি ঘষচে অভিমন্যুর পায়ের তলা প্রাণপণ শক্তিতে;—আর শিউচন্দ্রিকা ঘষছে হাতের তেলো, স্নেহ-ভরা দরদী হাতের স্পর্শ দিয়ে।

কতক্ষণ এ ভাবে কেটে যায় কে জানে!

শেষ পর্যন্ত আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বের নিরসন হয়। এ যাত্রা তাহলে অভিমন্যু বেঁচে গেল! স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে শিউচন্দ্রিকা। জানালার সার্সিগুলো সে খুলে দেয়। এত দিনের বদ্ধ গুমোট ভাবটা হালকা হয়ে আসে। এক ঝলক ভোরের বাতাস ঢুকে, রুগী-রুগী-গন্ধওয়ালা ঘরের আবহাওয়াটাকে বদলে দিয়ে যায়।

জানালার বাইরে শীতের প্রভাতের রোদ্দুর পড়েছে। কন্ধকাটা ভূতের মত কালো চিমনিটার একটা শিকার আজ একটুর জন্য ফসকে গিয়েছে। আজ শান্ত সমাহিত ভাব জগতের। ময়দানবের খোকারা পর্যন্ত আজ ঘুমুচ্ছে। না হলে এতক্ষণ গম্‌গম্ করে উঠত ম্যাকনীল সাহেবের রাজ্য বিভিন্ন ধ্বনির গমকে। সঙ্গে সঙ্গে কাঁপিয়ে তুলতো ইউনিয়ন অফিসের এই ঘরখানিকে পর্যন্ত। জানালা দিয়ে বাইরের জগতের খানিকটা বিষাদের পরশ লাগে শিউচন্দ্রিকা আর বিরিঞ্চির সংবেদনশীল মনে।···প্রতিবেশের উদাস নীরবতা ভঙ্গ করে মোড়ের ইঁদারা-তলা থেকে গলার স্বর ভেসে আসে···"যাওয়ার আগেও গরীবদের কথা ভোলেননি তিনি। কত চেষ্টা করে কাপড়ের কনট্রোল তুলে দিয়ে গিয়েছেন।"—পাড়া-কুঁদুলী রামশরণার মা'র গলা।···সেও আজ দেখছি ইঁদারাতলায় ঝগড়া করা ভুলেছে।···

'বিরিঞ্চি, বলে এস যে আজ যেন কেউ ইঁদারাতলায় বেশী চেঁচামেচি না করে। রামশরণার মা একবার আরম্ভ করেছে যখন, তখন আর ও ঘণ্টা দু'য়েকের মধ্যে থামবে না।

রুগীর ঘুম ভেঙ্গেছে।

প্রথমে সে তার পরিবেশ বেশ করে ঠাহর করে নেবার চেষ্টা করে। ...সেই পেরেকের সঙ্গে টাঙ্গানো ফাইল; কালো ঝুলের মত মাকড়সার জালগুলো সেই আগেকার মতনই আছে। বিরিঞ্চি! শিউচন্দ্রিকা! তাহ'লে আবার সেই ইউনিয়ন অফিসে? এখানে আবার কেন?...

তার সপ্রশ্ন দৃষ্টি গিয়ে পড়ে শিউচন্দ্রিকার মুখের উপর। উৎকণ্ঠার ছায়া পড়েছে সেখানে।...তার কথা তাহলে এখনও শিউচন্দ্রিকা ভাবে।...তবু সে এখানে থাকতে চায় না।...মিনাকুমারীর থেকে যত দূরে সম্ভব থাকতে চায় সে।...বুকে জড়ান আলোয়ান খানার জন্য তার দম আটকে আসছে। খুলে দাও ওখানা; শীগগির খুলে দাও... না, না, কিছুতেই খাব না এখন।...কপালে হাত বুলিয়ে দিতে হবে না।...

তবু শিউচন্দ্রিকা তার মাথার উস্কো-খুস্কো চুলগুলোর মধ্যে দিয়ে আঙ্গুল চালিয়ে চালিয়ে, একটু রুগীকে আরাম দেবার চেষ্টা করে। এই আঙ্গুলের স্পর্শ থেকে অবুঝ রোগীও বুঝতে পারে কি গভীর দরদ এর সঙ্গে মেশান।...

"আচ্ছা, দাও একটু খেতে'—বন্ধুর হাত থেকে খেয়ে অভিমন্যু তাকে কৃতার্থ করতে চায়।

তৃপ্তিতে ভরে ওঠে শিউচন্দ্রিকার মন।

"বেশী কথা বল না অভিমন্যু, এই রোগা শরীরে।"

"আমার অসুখ তো সেরে গিয়েছে"—একেবারে ছেলেমানুষের মত হয়ে গিয়েছে অভিমন্যু।

কত কথা মনে পড়ছে অভিমন্যুর। রুগীর মন এক কথা বেশীক্ষণ ভাবতে পারে না। এক বিষয় থেকে আর এক বিষয়ে মন চলে যায় লাফিয়ে লাফিয়ে। তার প্রশ্ন থেকেই শিউচন্দ্রিকা তা বুঝতে পারে।

মধ্যে মধ্যে অভিমন্যু অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই তখন সে ভাবছে মিনাকুমারীর কথা। তার চোখ ছলছল করে আসছে হৃদয় মথিত করা এক বেদনায়, যা রোগের ব্যথাটার চাইতেও অনেক তীব্র। দেহের প্রত্যেক স্নায়ু এ বেদনায় কাতর হয়ে পড়ে, সারা পৃথিবী তার এ ব্যথায় সাড়া দেয়।

কিন্তু রুগীর দুর্বল শরীর, আর ততোধিক দুর্বল মন নিয়ে সে শিউচন্দ্রিকার শ্যেন-দৃষ্টি থেকে বাঁচতে পারে না। সর্বজ্ঞ শিউচন্দ্রিকা ভাবে যে, অভিমন্যুর মনে পড়ছে ইউনিয়ন অফিসের পুরানো স্মৃতিগুলো। তার মনের মধ্যে গুমরে উঠছে নিশ্চয়ই সেই দিনকার লাঞ্ছনা-গঞ্জনার কথা।...

'বড় অস্থির অস্থির লাগছে না কি?'

কোন জবাব দেয় না অভিমন্যু।

"কি কষ্ট হচ্ছে বল, অভিমন্যু।" আঙ্গুল দিয়ে তার চোখের কোণটা মুছে দেয় শিউচন্দ্রিকা।

রুগী আবার কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে থাকে।

হঠাৎ বিরিঞ্চি শিউচন্দ্রিকাকে কি একটা ব'লে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। শিউচন্দ্রিকা উঠে সম্মুখের জানালার সার্সিটা বন্ধ করে দেয়।

জানালা বন্ধ করছ যে?

হাওয়া একটু জোর মনে হল। আবার তোমার ঠাণ্ডা লেগে যায় যদি,—তাই।

কোথায়, হাওয়া ছিল না তো? এত বেলাতে আবার ঠাণ্ডা কোথা থেকে আসবে?

শিউচন্দ্রিকা দেখে যে তার মিথ্যা ধরা পড়ে গিয়েছে। রুগীর গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলে যে ডাক্তার বাবু বলেছেন যে কোন কারণে উত্তেজিত হওয়া, আজ তোমার পক্ষে খারাপ। তুমি সেরে ওঠো; কাল সব বলব।

না, বল, এখনই বলো শিউচন্দ্রিকা।—অভিমন্যুর কথায় আবদারের সুর।

তাড়াতাড়িতে কি বলবে ঠিক পায় না শিউচন্দ্রিকা। মহাত্মাজীর মৃত্যুর খবরটি সে কিছুতেই জানতে দেবে না অভিমন্যুকে। সত্যমিথ্যা মিলিয়ে বলে—"শিরনিয়ার ব্যাপার নিয়ে তোমার উপর ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে। তাই তোমাকে এখানে এনে রাখা হয়েছে। পুলিশ-ভ্যানের হর্ণের শব্দ বলে মনে হয়েছিল; তাই পাঠিয়েছিলাম বিরিঞ্চিকে ব্যাপারটা কি দেখতে। আবার যদি তোমাকে কেউ দেখে-টেখে ফেলে, তাই জানালাটা বন্ধ করে দিলাম। অসুখের মধ্যে টানাপোড়েন হলে কি আর তোমার হাড়-ক'খান হাজত থেকে ফিরিয়ে আনতে পারব?"

কথাগুলো অভিমন্যু বিশ্বাস করে। তার হাসি আসে শিউচন্দ্রিকার এই অহেতুক চিন্তা দেখে। সারা জীবন জেল আর পুলিশ নিয়েই কেটেছে তাদের; আর আজ ভয় পাচ্ছে পুলিশ দেখে! পুলিশের হাতে ধরা পড়লেই ছিল ভাল। তাহলে আর ইউনিয়ন অফিসে এদের বোঝা হয়ে থাকতে হত না। বলীরামপুরে থাকার চাইতে জেলে থাকা অনেক ভাল! জেলের হাসপাতালে চিকিৎসার কোন ত্রুটি হত না, তা সে জানে। সেখানে সে থাকতো নিজের দাবিতে, কারও করুণায় নয়।—অভিমন্যু চায় মিনাকুমারীকে ভুলতে। যত সে ভুলতে পারছে না মিনাকুমারীকে, ততই তার আক্রোশ গিয়ে পড়ছে অন্যের উপর।

শিউচন্দ্রিকা তার চোখ-মুখ দেখে বুঝতে পারছে যে, সে একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছে।

"বড় শরীরটা আনচান করছে ; না ? কিছুক্ষণ চোখ বুঁজে শুয়ে থাক, ভাল লাগবে। আমি একটু রগের কাছটা আস্তে আস্তে টিপে দি।"

তবু কিছুতেই চোখ বোজে না অভিমন্যু। হঠাৎ গলার স্বর উঁচু করে বলে ওঠে অভিমন্যু—"ও কি ? জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, কে যেন ঝাণ্ডা নিয়ে চলেছে ?"

মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে শিউচন্দ্রিকার। কি ভুলই না সে করেছে! অভিমন্যুর মুখের কাছে তার দাঁড়ান উচিত ছিল জানালার দিক্‌টা ঢেকে। মজুরদের শোক-মিছিল বেরুচ্ছে শুনেই সে পাঠিয়েছিল বিরিঞ্চিকে—এই কাজে মজুরদের সাহায্য করতে, আর জানালাটা বন্ধ করে দিয়েছিল যাতে মহাত্মাজীর হত্যাকাণ্ডের কথা কোন রকমে রুগী জানতে না পারে, সেই জন্য।

"মজুরদের প্রোসেসন বেরিয়েছে। ওটা তারই ঝাণ্ডা।"—আর প্রোসেসনের কথা লুকোন চলে না অভিমন্যুর কাছে।

"তা ঝাণ্ডাটা বাঁশের ডগায় বাঁধেনি কেন ? দেখ তো, কি বিশ্রী দেখাচ্ছে। একেবারে বাঁশের মধ্যেখানটায় বেঁধেছে। তুমি তো কোন দিনই এই সব ছোট-খাটো জিনিষের উপর নজর দাও না। শিরনিয়ার মত অজ পাড়াগাঁয়ের চাষারাও এ সব জিনিষ এদের চাইতে ভাল জানে।"—অভিমন্যু শিউচন্দ্রিকাকে শুনিয়ে দিতে চায় যে, সে চলে যাওয়ার পর থেকে এই সব খুঁটিনাটি কাজে ঢিলে পড়েছে ; কেবল লেবর-কমিশনারের সঙ্গে দু'টো গুছিয়ে কথা বলতে পারলেই মজুর-নেতার কাজ শেষ হয়ে যায় না।

"চুপ কর অভিমন্যু, ডাক্তার বাবু তোমায় কথা বলতে বারণ করেছেন।"

"এই মিছিলের জন্যই বুঝি পুলিস এসেছে? প্রোসেসনের পর এরা নিশ্চয়ই মিটিং করবে। তুমি যাবে না শিউচন্দ্রিকা? তাহলে মিটিংএ বলবে কে? আমার জন্য তুমি যাচ্ছ না। না না, তুমি যাও। এরা ম্যাকনীল সাহেব মুর্দাবাদ এখনও বলছে না কেন? মজুর-ছেলেদের এত যে মার্চিংএর গান শিখিয়েছিলাম, এ ক'মাসে কি তাও ভুলে গিয়েছে? কেউ গাইছে না কেন? জানলাটা বন্ধ বলে বোধ হয় কিছু শোনা যাচ্ছে না। একটু জানালাটা খুলে দাও না শিউচন্দ্রিকা।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও শিউচন্দ্রিকা জানালার সার্সিটা খুলে দেয়। উৎকণ্ঠার আতিশয্যে ছিটকিনিটা খুলবার সময় তার হাত কাঁপে। আবদার না রাখলে, আবার হয়তো এখনই অভিমন্যু কান্নাকাটি আরম্ভ করবে।

জানালা খুলবার পরও কোন রকম জয়ধ্বনি, বা মজুরদের অন্য কোন রকম দাবির কথা বলে চেঁচামেচি, অভিমন্যু শুনতে পায় না। এ কি রকম প্রোসেসন! এ ক'মাসে কি মজুররা একেবারে বদলে গিয়েছে? অসুখে তার কান খারাপ হয়ে যায়নি তো? তা কি করে হবে? এখনই তো শিউচন্দ্রিকার কথা সে শুনতে পাচ্ছিল? জানালার নীচের চৌকাঠটার উপর দিয়ে একটা কালো স্রোতের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। অগণিত চলন্ত মানুষের মাথার উপরের সামান্য একটুখানি কেবল দেখা যাচ্ছে। এত লোকের পায়ের শব্দ পর্যন্ত আজ অভিমন্যুর কানে পৌঁছুচ্ছে না কেন?

অদম্য কৌতূহলে, আর অভিমন্যু নিজেকে স্থির রাখতে পারছে না।

"শিউচন্দ্রিকা, আমাকে বালিসে হেলান দিয়ে, উঁচু করে বসিয়ে দাও না একটু। শুয়ে শুয়ে কিছু দেখা যাচ্ছে না—এক লোকও না।"

"না না, ডাক্তার বাবু নড়া-চড়া করতে বারণ করেছেন। এত অবুঝ হলে কি চলে ?"

এবার শিউচন্দ্রিকার কণ্ঠস্বর আগেকার চাইতে দৃঢ়। রুগীর মন রাখতে গিয়ে রুগীর জীবনটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারে না সে। অনেক আবদার তার সে রেখেছে। আবার এখন নতুন আবদার! রুগীর পক্ষে ভাল হয়েছে যে শোক-মিছিলের লোকরা কেউ চেঁচামেচি করছে না। দু'জন দু'জন করে লাইন বেঁধে চলেছে। বাবুরা পর্যন্ত খালি পায়ে মিছিলে বেরিয়েছে। শোকের ভারে মাথা নুইয়ে পড়েছে সকলের। এই মজুরদেরই কত শোভাযাত্রার নেতৃত্ব শিউচন্দ্রিকা করেছে; কিন্তু এত সংযত, এত শান্ত তাদের কোন দিন দেখেনি।···

হঠাৎ নজরে পড়ে যে অভিমন্যু কাঁদছে।

"ছি অভিমন্যু! তুমি একেবারে ছেলেমানুষ হয়ে গিয়েছো।" মনে হয়, কথাটা একটু রুক্ষ হয়ে গেল এ রকম রুগীর পক্ষে। অনুশোচনায় শিউচন্দ্রিকার মন ভরে যায়। আচ্ছা, একটু সাবধানে আস্তে আস্তে উঠিয়ে বালিসে হেলান দিয়ে দিলে আর কি হবে? নড়াচড়া বেশী না হলেই হল।

বালিশে হেলান দিয়ে, তাকে আলগা ভাবে ধরে বসে শিউচন্দ্রিকা।

মুহূর্তের মধ্যে খুশী হয়ে ওঠে অভিমন্যু।···কত লোক চলেছে—কেউ কোন কথা বলছে না,—আশ্চর্য!—লাল-পাগড়িও আছে দেখছি, শিউচন্দ্রিকা মিথ্যা বলেনি।···মিছিলটা খুব বড় তাই দেখাবার জন্য এরা দু'জন দু'জন করে এক লাইনে চলছে,···শিউচন্দ্রিকা, বাবুদেরও দেখছি দলে টানতে পেরেছ!···আলবাৎ তোমার ক্ষমতা!···চিরকাল ওরা আলাদা ছিল ইউনিয়ন থেকে;···মেয়েরাও আছে দেখছি···মেয়েদের দলের আগে কে ঐ ঝাণ্ডা নিয়ে?···মিনাকুমারী না!···তীব্র উত্তেজনায় থর-থর করে কাঁপছে তার সারা দেহ।

শিউচন্দ্রিকা তাকিয়ে দেখে বাইরে,—মেয়েদের দলের আগে আগে চলেছে মিনাকুমারী আর রুকণী···জানালা দিয়ে আর দেখা যাচ্ছে না তাদের।

অভিমন্যু নিজের অজ্ঞাতে কখন শিউচন্দ্রিকার হাতখানা চেপে ধরেছে। চোখ দু'টো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে কোটর থেকে। তীব্র উত্তেজনার ঢেউয়ে আছাড় খেয়ে-খেয়ে পড়ছে তার প্রতিটি স্নায়ু।···

এই ভয়ই করেছিল শিউচন্দ্রিকা। এর জন্য দায়ী সে নিজে; সে যদি আর একটু শক্ত হতে পারত রুগীর উপর, তাহলে বোধ হয় এ কাণ্ড হত না।···একটি পাখা নেই ঘরে যে একটু বাতাস করে অভিমন্যুকে।···তার কপালটা একটু একটু ভিজে-ভিজে লাগছে; ···শুকনো ঠোঁট দু'টো কেঁপে-কেঁপে উঠছে।···অভিমন্যু বালিসে কাত হয়ে শুয়ে পড়ল।···একটু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছে, মনে হচ্ছে।··· বোধ হয়, বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে হঠাৎ এই উত্তেজনার পর;···যা দুর্বল শরীর!

তাকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে শিউচন্দ্রিকা।···খানিকটা বিশ্রাম পেলেই রুগীর এ ভাবটা বোধ হয় কেটে যাবে।···একটু কিছু খেতে দেওয়া উচিত বোধ হয়,···এই বিরিঞ্চি এল বলে।···

অভিমন্যুর মনের মধ্যে তুফানের তোলপাড় চলেছে।...একবার যেন মনে হল, মিনাকুমারী এদিকেই তাকিয়েছিল।...না না, সেটা বোধ হয় তার মনের ভুল। বাইরের আলো থেকে কি অন্ধকার ঘরের ভিতর কিছু দেখা যায়?...মিনার মুখ-চোখও মনে হয়েছিল বিষাদে ভরা।...কি ক'রে ঐ মিনা অভিমন্যুর জীবনটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পেরেছিল!... মিনাকুমারী, মিনাকুমারী, মিনাকুমারী!...যার থেকে দূরে পালাবার সে প্রাণপণে চেষ্টা করছে...

অভিমন্যু এর মধ্যেও বুঝতে পারছে যে শিউচন্দ্রিকার হাতের মধ্যে, তার হাতখানা ঠক-ঠক করে কাঁপছে।

হঠাৎ জানালার সম্মুখ দিয়ে খবরের কাগজওয়ালা হেঁকে যায়—তাজা খবর! তাজা খবর! মহাত্মাজীর মারহাঠী হত্যাকারী গ্রেপ্তার! সার্চলাইট, ইণ্ডিয়ান নেশন, পত্রিকা, ষ্ট্যাণ্ডার্ড। প্রার্থনা সভায় তিন বার গুলী! তাজা খবর!

বাইরে বিরিঞ্চির গলা শোনা যায়;—এখানে চেঁচামেচি কর না। ঘরে রুগী আছে।

বেশ নার্ভাস হয়ে পড়ে শিউচন্দ্রিকা। এত চেষ্টা, সে কি এরই জন্য!

শি-উ-চ-ন্দ্রি-কা! অভিমন্যুর কথা, কাতর আর্তনাদের মত শোনায়। তার কানে গিয়েছে, কাগজওয়ালার চীৎকার।

'ম-হা-ত্মা-জী।'—

প্রত্যাশিত প্রশ্ন শেষ হওয়ার আগেই, তার অস্ফুট কণ্ঠস্বর থেমে যায়। সব শেষ হয়ে যায় একটা অদৃশ্য হাতের এক ঝাঁকানি খেয়ে। তার মাথা বালিশের এক পাশে ঢলে পড়ে।

খট্-খট্ করে অফিস-ঘরে কতকগুলো ভারী বুটের শব্দ হয়। জানালার উপর দিয়ে দু'-একটি লাল-পাগড়ী দেখা যায়। আজকের মত এই শোক-দিবসেও আজাদ ভারতের পুলিসের কর্তব্যনিষ্ঠায় ত্রুটি নেই। দু'জন পুলিশ দরজার দু'পাশে সোজা হয়ে দাঁড়ায়,—সাবধানের মার নেই। তার পর দারোগা সাহেব ওয়ারেণ্ট হাতে নিয়ে 'ডেঞ্জারাস' ফেরারীর ঘরে ঢোকেন।

সামান্য একটু দেরী করে ফেলেছেন দারোগা বাবু।

শ্রীমিনাকুমারী দেবী

সমীপেষু

এখনই পুলিশের পরোয়ানা পেয়েছি,—এ জেলা থেকে বাইরে চলে যাওয়ার অর্ডার। জন-নিরাপত্তা অর্ডিনান্সের ধারায় না কি আমি পড়ি। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, আমি দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিকদের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছি। সরকারের অসীম করুণা; শোকে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন বলে তাঁরা মহাত্মাজীর শ্রাদ্ধ-দিবস পর্যন্ত এ পরোয়ানা জারি করেননি। হয়ত এ খবর আপনি আগে থেকেই জানতেন, কেন না সব কিছুই জয়নারায়ণ প্রসাদের করানো। আমাদের ইউনিয়নের কপালে কি আছে, তা' পরিষ্কার চোখের সম্মুখে দেখতেই পাচ্ছি। আপনারা তো তাই চাচ্ছিলেন; অভিমন্যু যদি থাকত, তাহ'লে হয়ত সে এই দুঃসময়ে ইউনিয়নের কাজের ভার আবার নিতে পারত; কিন্তু অভিমন্যুর জীবনের জন্য দায়ী আপনি। পরিষ্কার কথা বলা আমার অভ্যাস। এর জন্য আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে অসঙ্গত শিষ্টাচার দেখাব না। অভিমন্যুকে লোকচক্ষে হেয় করবার জন্য, তার লেখা যে চিঠিখানা আপনি ম্যানেজার সাহেবকে দিয়েছিলেন, সে চিঠিখানা এই সঙ্গেই আছে। আপনি বোধ হয় ভেবেছিলেন যে, আপনার লেখা চিঠিখানা সে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। তাই বোধ হয় আপনার সাহস হয়েছিল তার চিঠিখান ম্যানেজার সাহেবকে দেবার। চিঠিখানা অভিমন্যু শেষ দিন পর্যন্ত বুকে করে রেখেছিল। কিন্তু নিজেকে বাঁচাবার জন্য, লেবার-কমিশনারকে সেখানা দেখায়নি, পাছে আপনি সকলের চোখে ছোট হয়ে যান সেই কথা ভেবে। সে চিঠিখানাও আপনার কাছে; ফেরত দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। সঙ্গে অভিমন্যুরই আরও কি কতকগুলো

কাগজ-পত্র আছে ; আমি সবগুলোকে একসঙ্গে ক্লিপ দিয়ে এঁটে রেখে দিয়েছিলাম। অভিমন্যুর ঝোলাটা, আর তার মধ্যের এই কাগজ-পত্রগুলো, সেদিন প্রাণে ধরে চিতার মধ্যে ফেলে দিতে পারিনি। এখন আমি কোথায় যাব, কিছুই ঠিক করিনি। এর মধ্যে আর লট-বহর বাড়াতে চাই না ; নিজের জিনিষ-পত্রই সঙ্গে নিয়ে যেতে পারছি না বোঝার ভয়ে।

শেষ কালে আসল কথাটা বলে দিই। সেদিন শ্মশানে আপনার চোখে জল দেখে বুঝেছিলাম যে অভিমন্যুর স্মৃতির রেশ আপনার মন থেকে এখনও মুছে যায় নি। রহমতের বিবির কথায় জানলাম যে, আজ আপনার উপোস। এতে আমার ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়েছে। সেই জন্য অভিমন্যুর জিনিষগুলো আপনার কাছে দিতে সাহস করছি। যদি ভুল বুঝে থাকি, ক্ষমা করবেন, আর পুড়িয়ে ফেলবেন এগুলো। নমস্কার।

বিনীত—শিউচন্দ্রিকা

রহমতের বিবির হাতে চিঠিখানা পাঠিয়ে দিয়েছিল শিউচন্দ্রিকা। আর সঙ্গে দিয়েছিল অভিমন্যুর সেই ঝোলাটা।

অভিমন্যু মারা যাওয়ার দিন শ্মশান-ঘাট থেকে আসবার পরই সে লিখতে বসেছিল তার অভ্যাস মত পরের দিনের কর্মসূচী ; শ্মশানের সেই সন্ধ্যার চিন্তাগুলো সে সেইখানেই ছেড়ে এসেছিল। তার দৈনন্দিন কর্মজীবনে কোন বৈলক্ষণ্য কেউ দেখতে পায়নি পরের দিন। সে মনে মনে ঠিক করেছে যে, প্রতি বছর অভিমন্যুর নামে, ঐ দিনে মজুররা একটি দিবস পালন করবে। মহাত্মাজীর নামের সঙ্গে অভিমন্যুর নামটা এমন ভাবে জড়িয়ে গিয়েছে যে, সেই দিবস পালনের মিটিংয়ে নিশ্চয়ই প্রচুর লোক জুটবে। আর এই হিড়িকে অভিমন্যুর স্মৃতিরক্ষার্থে কিছু চাঁদা তুলে মজুরদের নাইট-স্কুলটার জন্য একটা স্থায়ী ঘর তৈরী করে নিতে পারলে মন্দ হয় না।

কিন্তু তবু কে বলে যে, শিউচন্দ্রিকা সকল প্রকার ভাবপ্রবণতার বাইরে? তাহ'লে কি আর অভিমন্যুর ঝোলাটা মিনাকুমারীর কাছে পাঠানো দরকার মনে করত?

মিনাকুমারীর দু'দিন থেকে চলছিল উপোস। কাল গিয়েছে মহাত্মাজীর তিরোধানের পর তেরো দিনের দিন! মিল ছিল বন্ধ। রুকণী বোঝে যে, দ্বিতীয় দিনের উপবাসটা কার জন্য। সে বারণ করেনি।

অভিমন্যু মারা যাওয়ার দিন থেকেই তার মনের মধ্যে তোলপাড় চলেছে;—তার উপেক্ষা সহ্য করতে না পেরেই নিশ্চয় অভিমন্যু চলে গিয়েছিল এখান থেকে। তার পর তাকেই একবার দেখবে বলে বোধ হয় ছুটে এসেছিল ইউনিয়ন-অফিসে। তার পর তো সব শেষই হয়ে গেল। সেদিন শ্মশানে যখন চিতার ছাই নিয়ে কাড়াকাড়ি করছিল সকলে, তখন তাকেও এক মুঠো এনে দিয়েছিল রহমতের বিবি। মাথায় ঠেকিয়ে আঁচলে বেঁধে নিয়েছিল সে। জর্দার কৌটোটা খালি করে তাইতেই এনে রেখেছিল সেটুকুকে। এখনও মাথার কাছে রয়েছে কৌটোটা। পশ্চিমের জানালা দিয়ে রোদ্দুর পড়ে ঝক ঝক করছে সেটা। তাকানো যায় না; তাকাতে গেলে চোখে জল আসে। এই শীতের বিকালেও সেটা গরম আগুন হয়ে উঠেছে; বোধ হয় অভিমন্যুর মনের আগুনের আর্দ্র-উষ্ণতা এখনও লেগে রয়েছে সেটাতে।...দীক্ষিতদের বাগানে এক দিন সিঁথির কাছের এক গোছা চুল কেঁপে-কেঁপে উঠছিল বার বার, একটা গরম ভিজে নিশ্বাস পড়েছিল এই কৌটোতে হয়ত থাকতে পারত সেই সিঁথির সিঁদুর।

রুকণীর মিল থেকে ফিরতে এখনও ঘণ্টাখানেক দেরী। এ কয় দিন সে বন্ধুর খুব দেখা-শুনো করেছে। মিনাকুমারী এক রকম নাওয়া-খাওয়া ছেড়েই দিয়েছে সেই দিন থেকে। একটা অনুতাপের গ্লানি এসেছে মিনাকুমারীর মনে, এ কথা রুকণীও বুঝতে পারছে। কিন্তু তার দোষী

মন এ কথা তুলতে পারে নি তার বন্ধুর কাছে। মিনাকুমারী বাইরের খবর রাখে কম। মজুরণীদের সঙ্গে ক্যান্টিন আর ক্রেশেতে দরকারের চাইতে বেশী কথা বলা তাদের বারণ,—মিল-মালিকের হুকুম। অনাথালয়েও সে মুখ বুজে কাজ করে চলে আসে। তার যা কিছু কথাবার্তা, হয় রুকণী না হয় রহমতের বিবির সঙ্গে। তারা ঘুনাক্ষরেও কেউ কোন দিন অভিমন্যুর চিঠির কথা তাকে বলেনি।

কাল গিয়েছে গান্ধীজীর শ্রাদ্ধ-দিবস। তাই কাল রুকণীরা সকলে খুব ব্যস্ত ছিল। মজুররা অহোরাত্র গেয়েছে রামধুনের গান,—"সবহিকো সম্মতি দে ভগবান"—পাপীদের সুমতি দাও, ম্যাকনীল সাহেবকে সুমতি দাও, জয়নারায়ণকে সুমতি দাও, অফিসারগুলোকে সুমতি দাও, অনাথালয়ের মেয়েদের সুমতি দাও। হে ঈশ্বর, হে আল্লা, হে পতিত-পাবন, বলীরামপুরের পাপ কাটিয়ে দাও। গলা ভেঙ্গে গেলেও তারা থামেনি। সারা অন্তর নিংড়ানো রসে তাদের ভাঙ্গা-গলা ভিজে ছিল। অনাথালয়ের ছোট ছেলেদের একটা ব্যাণ্ড-পার্টি আছে। কাল তারা সারা দিন খঞ্জনী বাজিয়ে রামধুন গেয়ে বেড়িয়েছে। ছেলেদের দলের সঙ্গে মিনাকুমারী আর রুকণীও ছিল। উপোস করে, রোদ্দুরের মধ্যে ঘুরে-ঘুরে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়লে দীক্ষিতদের মুকুল-ভরা আম-বাগানের ছায়ায় মিনাকুমারী তাদের বসিয়েছিল। সেখানেও তাদের রামধুন থামেনি। সে বলেছিল, তাদের সকলকে একটা করে টুপি কিনে দেবে পরের দিন, বিনা টুপিতে তাদের মানায় না। লেবার-কমিশনারের রায়ের পরের মাস থেকে পাঁচ টাকা করে মাইনে বেড়েছিল মিনাকুমারীর। এই মাসের মাইনেটি তুই তারিখে পাওয়ার পর থেকে কেন যেন মনে হচ্ছে যে, এর মধ্যে থেকে পাঁচটা টাকা তার ন্যায্য প্রাপ্য নয়। এ সুমতি তার সেদিনের শ্মশানের রামধুন শোনার ফল নয়। তবে এ কথা ঠিক যে, সেদিনকার চিতার আগুনের আলোতেই নিজের মনটার আসল রূপ

ধরা দিয়েছে তার কাছে। মনের আগুন তাতে বেড়েছে বই কমেনি।

কাল দোকান-পাট বন্ধ ছিল। আজ সে আনিয়েছে কতকগুলো গান্ধী-টুপি, ব্যাণ্ড-পার্টির ছেলেদের জন্য। এই ছেলেরাই ট্রেনে-ট্রেনে 'কেসরপাক' বিক্রি করত আগে। আজকের মত দিনে, সে এই দান করে নিজের মনের বোঝা হালকা করতে চায়; দোষ-স্খালনের চেষ্টা করে একটু তৃপ্তি পেতে চায়। মহাত্মাজীর স্মৃতিরক্ষার্থে মিলের তরফ থেকে কি করা যায়, স্থির করার জন্য মিটিং আছে আজ। তাই রুকণী আর আজ অনাথালয়ে যেতে পারবে না। মিনাকুমারী উপোস করে আছে বলে আজ ছুটির দরখাস্ত রুকণীর হাতে অপিসে পাঠিয়ে দিয়েছে।

অভিমন্যুর কথাই কেবল তার মনে আসছে আজ, আজকে তো সে তাই চায়। ডুবে থাকতে চায় অভিমন্যুর মধ্যে। আজকে সে ভাবতে চায়, আমের বোলের গন্ধ-ভরা বাগানে সে শুয়ে রয়েছে চটচটে মধুলাগা ঝরা-পাতার উপর। আমের মুকুলের সুগন্ধ আর অভিমন্যুর স্মৃতির সৌরভ, দুই মিলে এক হয়ে গিয়েছে!...অভিমন্যু যেত সেই 'কেসরপাক' নিয়ে অনাথালয়ে।...টানা-টানা চোখের কালো মণির মধ্যে হিসাব লিখিয়ে মিনাকুমারীর ছবি উঠেছে।...

সে অন্যমনস্ক-ভাবে টুপির মোড়কটা খুলতে বসে।...বেশ টুপিগুলো—অনাথালয়ের ছোট-ছোট ছেলেদের মুখগুলো টুপি পেয়ে হাসিতে ভরে উঠবে। এই রকম সরল প্রাণ-খোলা হাসি ছিল অভিমন্যুর! তাই ছোট ছেলেদের হাসতে দেখলে তার কথা মনে পড়ে।...

হঠাৎ মিনাকুমারীর নজর পড়ে মোড়কের কাগজখানার উপর।—বলীরামপুর!...বলীরামপুরের আবার কি খবর কাগজে দিল? কাগজের নিজস্ব সংবাদদাতার দেওয়া খবর। দুই তারিখের।

"মহাত্মাজীর মৃত্যু-সংবাদ শোনা মাত্র স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মী

শ্রীঅভিমন্যু সিংহের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায় এবং, তিনি তৎক্ষণাৎ ইহলোক ত্যাগ করেন। অতি সমারোহের সহিত তাঁহার দেহ শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়। স্থানীয় মিল-কর্তৃপক্ষ এবং মিলের প্রত্যেক মজুর গভীর শোকসন্তপ্ত চিত্তে শবানুগমন করিয়াছিল।"

পৃথিবীতে এত লোক থাকতে তারই জিনিষটা দোকানদার এই কাগজের টুকরোটা দিয়ে মুড়ে দেবে কেন? দৈবের কোন অদৃশ্য সঙ্কেত নয় ত? আবার সে পড়ে খবরটা, এটা যেন একটা নতুন খবর তার কাছে। ছাপার অক্ষরের অভিমন্যু সিংহের নামটুকু মিনাকুমারীর একান্ত আপন জিনিষ, একেবারে নিজস্ব। সংবাদ পাঠানোর পর, নিজস্ব সংবাদদাতাটির হয়ত অভিমন্যু সিংহের নামের কথাটা আর কোন দিন মনেই পড়বে না।...তার কিন্তু থাকবে ঐ নামটির সঙ্গে জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধ। কোন দিন ঘুচবার নয়।...হাতের মুঠো আলগা করে যে জিনিষটাকে সে নিঃশব্দে ফেলে দিয়েছিল পথের ধূলোয়, আজ তারই জন্য মিনাকুমারীর মন কেঁদে মরে : এখন এই দুর্বহ জীবনের পুঁজি থেকে গিয়েছে কেবল কতকগুলো হাতের তেলোর রেখা। এই অসার্থক জীবনের গ্লানি তাকে বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।... অভিমান করেছিল অভিমন্যু।...তার অভিমন্যুকে সে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল বলে।...

মিনাকুমারী মোড়কের কাগজখানা থেকে খবরটুকু ছিঁড়ে নেয়। তার পর ভাঁজ করে রেখে দেয় কৌটটার ভিতর।...তার স্মৃতির ছাইটুকুর সঙ্গে মিশে থাক্ অভিমন্যুর নামটা।

কৌটোটার উপর থেকে রোদ্দুর সরে গিয়েছে অনেকক্ষণ। বেলা পড়ে এসেছে।

রহমতের বিবি এসে দোর-গোড়ায় দাঁড়ায়।

"এই ঝোলাটা দিয়েছে, শিউচন্দ্রিকা বাবু, তোমাকে দিতে। চিঠি

আছে ভিতরে। আমার মেয়েটার আবার খুব জ্বর এসেছে আজ। যাই আমি এখন। অনাথালয়ে যাবার রিক্সা ডেকে দিয়ে যাব না কি? এই উপোসের উপর আজ আর না যাওয়াই ভাল।"

রহমতের বিবি চলে যায়।

অতি পরিচিত পুরাণো ঝোলাটা খুলবার সময় তার হাত থরথর করে কাঁপে।...শিউচন্দ্রিকা কেন তাকে চিঠি দেবে? পাট-করা ধুতিখানা সরাতেই চোখে পড়ে খানকয়েক কাগজ—কোণের দিকটা ক্লিপ দিয়ে আঁটা; শিউচন্দ্রিকার প্রতি কাজে শৃঙ্খলা আছে।

উপরের খানি শিউচন্দ্রিকার চিঠি; মিনাকুমারীকে লিখেছে। যাবার আগে চরম আঘাত দিয়ে গিয়েছে শিউচন্দ্রিকা। চিঠির ছত্রগুলো জাঁতার মত পিষে ফেলছে মিনাকুমারীকে। এক-একটা কথা তো নয়, যেন কারখানার দাঁতওয়ালা চাকার এক একটা দাঁত। কট্-কট্ করে কেটে ফেলছে তার চক্রবালের মধ্যে পড়া মনটাকে। মোচড় দিয়ে দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছে তার অন্তরের ভিতরটা; নিংড়ানির রসে ঝাপ্সা হয়ে আসছে চিঠিখানা।···কোন্ চিঠি অভিমন্যু তাকে লিখেছিল? সে তো কিছুই জানে না। ম্যানেজারের কাছে সে আবার কবে অভিমন্যুর লেখা চিঠি দিয়েছিল? ···কি সব আবোল-তাবোল লিখেছে শিউচন্দ্রিকা?···এখানা আবার কি? ভৃগুর গণনা!···তার পরেরটা! এ তো তারই নিজের হাতের লেখা চিঠি! দীক্ষিতদের বাগানের আমের মুকুলের সুবাস যেদিন তাদের দু'জনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল।···কত বার পড়েছে অভিমন্যু এই ছত্রক'টিকে। মিনাকুমারীর কম্পিত হাতের এই কালির আঁচড়গুলো চুপসে গিয়েছে, দুই তিন জায়গায়,—হয়ত অভিমন্যুর চোখের জলে।··· তারই উপর আবার এখন মিনাকুমারীর চোখের জল পড়ছে। বিস্মৃতির শুক্‌নো শৈবাল আবার সবুজ হয়ে উঠছে নোণা সমুদ্রের স্বাদ পেয়ে।

আবার পাতা ওলটায় মিনাকুমারী। যখের সিন্দুকের ডালা খুলে যায় তার দৃষ্টির পরশে।···অভিমন্যুর লেখা চিঠি, অভিমন্যু তাকেই লিখেছে, এ হাতের লেখা কি ভুল হবার যো আছে; কত দিনের দেখা, 'কেশরপাকে'র বিলের ভাউচারে! তাকে লেখা চিঠি অথচ তার হাতে পড়ল না কেন? কি করে ম্যানেজার সাহেবের হাতে গেল? মিথ্যাবাদীর দল! অভিমন্যু চিঠি লিখেছে তার মিনাকুমারীর কাছে; সে চিঠি পেল অন্য লোক! কার হাতে চিঠি দিয়েছিল সে খবর যে বলতে পারত, সে তো আজ আর নেই।···

রাগে-দুঃখে নিজেকে কুটি-কুটি করে ফেলতে ইচ্ছা করে তার। এ চিঠিখান সে সময়ে পেলে হয়ত ছোট্ট এক টুকরো জগতের কাহিনী বদলে যেতে পারত। আজকের এ অশ্রু সেদিন বইলে হয়ত ধুয়ে-মুছে ফেলতে পারত ভৃগুর লেখার আঁচড়গুলো।···

···যাবে না কি সে এখনই ম্যাকনীল সাহেবের কাছে এর সম্বন্ধে একটা বোঝা-পড়া করতে?···

এর পরের খানা এস, ডি, ও, সাহেবের চিঠি।···অভিমন্যুকেও সঙ্গে লইয়া আসিবেন।'···সাপের চোখের মত চোখ দু'টো ছিল এস, ডি, ও, সাহেবের। সূচ ফুটিয়ে দিতে ইচ্ছা করে সে দু'টোর মধ্যে। ডাক-বাংলার নরকে অভিমন্যুকেও ডেকেছিল।...পার্টি-মিটিংয়ের চার নম্বর প্রস্তাব।...অভিমন্যুর নাম-ডাক, সম্মান-প্রতিপত্তি সব সে পায়ের নীচে পিষে গুঁড়ো-গুঁড়ো করে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। তারই চিঠিখানার দাম দিচ্ছে জয়নারায়ণ প্রসাদ, কিস্তিবন্দীতে মাসে পাঁচ টাকা করে।...

শুকনো ঘা আবার তাজা দগদগে হয়ে উঠেছে,—নোণা জল পড়ছে তাতে ফোঁটা-ফোঁটা করে।···আরও কি কতকগুলো হাবিজাবি কাগজ।···আমের মুকুলের সুগন্ধ আসছে ঘরে, অভিমন্যুর বারতা নিয়ে।

বাইরে রিক্শাওয়ালা ডাকে, "মাইজী!"

"আজ আমি হেঁটেই যাব। তুমি যাও।"

কাগজের লেখাগুলো ঝাপসা হয়ে আসছে চোখের জলে।—

ঝাপসা হয়ে এসেছে ঘর-দুয়োর। ওঃ! সন্ধ্যা হয়ে গেল কখন! মিনাকুমারী ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ায়, টুঁপির মোড়কটা নিয়ে।···

···আকাশ, মাঠ, পথ-ঘাট সব ঢেকে গিয়েছে অন্ধকারে, সেই সেইদিনকার সাঁঝের মত। গ্লানির অন্ধকার হঠাৎ ঢেকে ফেলেছে বলীরামপুরের নিরর্থক জগৎটাকে।

সে ছুঁড়ে ফেলে দেয় হাতের মোড়কটিকে, অনাথালয়ের পথের ধারের নালীটার মধ্যে।

···ছুটে চলেছে মিনাকুমারী। অভিমন্যু ডেকেছিল মিনাকুমারীকে; চিঠি দিয়েছিল, এখনও ডাকছে তাকে অন্ধকারের মধ্যে, দীক্ষিতদের আম-বাগানে।···টপটপ করে মধু ঝরছে শুকনো পাতায় উপর; ঝরা-পাতার দরজায় টোকা মারছে গাছ-ভরা আমের মুকুল।··· দীক্ষিতদের আম-বাগান এক দুর্বার আকর্ষণে তাকে টানছে। মৃগনাভির গন্ধ লক্ষ্য করে পাগল হয়ে মৃগী ছুটেছে। আম-বাগানের দিক্ থেকে কনকনে পশ্চিমে হাওয়া লাগছে তার সর্বাঙ্গে। গলায় পাক দিয়ে জড়ান স্কার্ফটার প্রান্ত দু'টো এই হাওয়াতে উড়ছে। সেই আম-গাছটার মুকুল-ভরা নীচু ডালটা দুলে দুলে উঠছে। ডাকছে তাকে হাত ছানি দিয়ে। এখানেই আজ সে ফিরে পাবে তার অভিমন্যুকে। তার কণ্ঠাশ্লেষের মাদকতায় অবসন্ন হয়ে আসছে তার দেহ।···যন্ত্রনার তীব্র মধুরতার মধ্যে দিয়ে সে কাছে পাচ্ছে তার অভিমন্যুকে,—আরও কাছে, আরও,···পিষে যাক সে;··· যাক, যদি শ্বাসরোধ হয়ে যায় তার নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে···

প্রসন্নতার দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে চিত্রগুপ্তের মুখ।···মিনা-কুমারীর দেহের ময়না-তদন্তের রিপোর্টখানা এর পর দিলে ফাইলটায়

আর খুঁত থাকত না কিছু। যাক গে !···শেষ যখন হয়েই গিয়েছে, তখন আর মৃত্যুর পরের দলিল-দস্তাবেজ দিয়ে কেবল কাগজের বোঝা বাড়ানো ছাড়া তো আর কিছু নয়···কাগজ-পত্র, ঘটনার পারম্পর্য ; কয়েকটি মনের ঘাত প্রতিঘাত, সাজানো হয়েছে ঠিক যেমনটি তিনি চেয়েছিলেন, সেই রকম ! এখনই এই ফাইলটাকে শেষ করে তুলে রাখতে হবে। এর পর তিনি নেবেন একখানা 'স্বাভাবিক মৃত্যু'র ফাইল। অসংখ্য ফাইল সম্মুখে,—নিশাস ফেলবার ফুরসৎ কোথায় তাঁর !

তিনি কলম নিয়ে বসেন তাঁর মন্তব্য আর উপদেশ লেখককে জানাতে।

চিত্রগুপ্ত তাঁর সাহিত্যিক ছদ্মনাম। তিনি এক জন প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সমালোচক। সাহিত্য-সমালোচনায় পয়সা নাই। সেই জন্য লেটারহেড ছাপিয়ে একটা নূতন ব্যবসা খুলে বসেছেন,—ডাকযোগে গল্প লেখা শেখানো। নূতন লেখকদের লেখার দোষ-ত্রুটি সংশোধন করে দেওয়া, আর তাঁর বিজ্ঞাপন যদি বিশ্বাস করতে হয় তাহ'লে. পনরটি মাত্র পাঠে পুরোদস্তর লেখক তৈরী করে দেওয়া—'ইহাই চিত্রগুপ্ত-বাণী-প্রতিষ্ঠান' এর উদ্দেশ্য। যে কোন কাগজ খুললেই নজরে পড়ে—'আপনি যদি বাড়িতে বসিয়া মাসিক দুই শত টাকা রোজগার করিতে চান, আর যদি লেখার একটুও সখ থাকে, তাহা হইলে 'চিত্রগুপ্ত-বাণী প্রতিষ্ঠান'এর নিকট বিশদ বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।'

পূর্ণ পাঠক্রম সাড়ে তিনশ' টাকায় হয়ে যায়। মফঃস্বলের উদীয়মান লেখকদের সুবর্ণ সুযোগ। আর সব চাইতে বড় সুবিধা যে, এই সকল নবীন যশোলিপ্সু লেখকদের লেখা, চিত্রগুপ্ত তদ্বির করে মাসিক পত্রিকাদিতে ছাপিয়ে দিতেও চেষ্টা করেন।

আজ-কাল মিলন, বিরহ, স্বাভাবিক মৃত্যু, আত্মহত্যা, বিবাহ-বিচ্ছেদ, আকস্মিক দুর্ঘটনা ইত্যাদি পনরটি পাঠে তিনি পনরটি প্লটের সঙ্কেত দিয়ে দেন। ঐ সঙ্কেতের আধারে গল্প লিখে এলে সেগুলি সম্বন্ধে নিজের মন্তব্য আবার লিখে পাঠান লেখককে।

সেই চিঠিই তিনি এখন লিখতে বসেছেন। এর আগের লেখা চিঠি-পত্রগুলো দেখে তবে তিনি জবাব দেবেন।···

আত্মহত্যা পড়ে ৩নং পাঠে।

'চিত্রগুপ্ত-বাণী-প্রতিষ্ঠান' থেকে প্রেরিত, চার নম্বর পাঠের গল্পের খসড়াটা তিনি পড়েন।—

(১) মিনাকুমারীর চিঠি; (২) অভিমন্যুর চিঠি; (৩) নায়কের মৃত্যু সম্বন্ধে জ্যোতিষীর গণনা; (৪) অনাথা নায়িকা—(৫) নায়কের মৃত্যু—(৬) নায়িকার আত্মহত্যা···

এর পরের কাগজখানাও পড়েন চিত্রগুপ্ত। চার নম্বর পাঠের সঙ্গে এখানাও পাঠানো হয়েছিল।—

(বিশেষ গোপনীয়)

লেখার জনপ্রিয়তা বাড়াইবার জন্য কি কি করিবেন।*

(ক) একটি গুরুত্বপূর্ণ সমসাময়িক ঘটনা গল্পের ভিতর ঢুকাইয়া দিবেন।

(খ) খানিকটা রাজনীতি (ফিকা গোছের) গল্পের ভিতর যেন স্থান পায়।

(গ) সাধারণ-বুদ্ধিতে অবিশ্বাস্য বা অসম্ভাব্য মনে হইলেও স্থূল নাটকীয় উপাদান বহুল পরিমাণে গল্পের ভিতর দিতে ভুলিবেন না।

(ঘ) শোষক ও শোষিতের সংঘর্ষের কথা যেমন করিয়া হউক গল্পের ভিতর আনিতে চেষ্টা করিবেন।

'চিত্রগুপ্ত বাণী-প্রতিষ্ঠানের' ছাপমারা লেটার-প্যাডে, গল্পের লেখককে চিঠি লিখতে আরম্ভ করেন চিত্রগুপ্ত:

—"প্রিয় মহাশয়,——

* এই নির্দেশগুলি ১৯৪৭-৪৮ সালের জন্য। প্রতি বৎসর প্রয়োজন মত ইহার পরিবর্তন করা হয়। বার্ষিক দশ টাকা করিয়া দিলে, আমাদের পুরাতন ছাত্রদের নূতন নির্দেশ (ছাপানো) প্রতি বৎসর পাঠাইয়া দিই। চিত্রগুপ্ত

সমাপ্ত